A

PRIMER ON HYGIENE

OR

ELEMENTARY LESSONS

ON THE

LAWS OF HEALTH

WITH SPECIAL APPLICATION TO THE CLIMATE OF INDIA.

BY

BHOOBUN MOHUN SIRCAR,

LICENTIATE IN MEDICINE AND SURGERY.

স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধি।

বঙ্গবিদ্যালয়সমূহের নিমিত্ত

ডাক্তার শ্রীভুবনমোহন সরকার-

প্রণীত।

Calcutta.

Printed by G. C. Ghoshal, Jyotisha Prokasha Press,
7, Shib Krishna Dan's Lane.
'ublished by J. N. Ghose, 88/5, Mooktárám Bábu's Sroet.

1882.

[All ri... ...served.]

মূল্য ।৷ ... মাত্র।

TO

JOHN MARTIN COATES, Esq., M. D.,

BRIGADE SURGEON, IND. MED. SERVICE,

PRINCIPAL

OF THE

MEDICAL COLLEGE, BENGAL

AND

[LATE SANITARY COMMISSIONER OF BENGAL.]

THIS TREATISE,

IS RESPECTFULLY INSCRIBED

AS A SMALL MARK OF REGARD AND ESTEEM

FOR HIS HIGH PROFESSIONAL AND MORAL WORTH

By his Friend,

THE AUTHOR.

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকের প্রারম্ভে শারীর শাস্ত্রের মূলসূত্রগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, পশ্চাৎ স্বাস্থ্য-রক্ষার বিশেষ বিবরণ যথাসাধ্য সরলভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এরূপ না করিলে, স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ক পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকে। দেশে শিক্ষার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নত হওয়াতে, এক্ষণে অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিধায়ক পুস্তকও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকতর পরিমাণে উন্নত ও সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। আমি এই পুস্তক সেইরূপ উন্নত ও সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ বা অনুকরণ করি নাই,। যাহাতে দেশ কাল ও পাত্রের উপযোগী হয়, প্রস্তাবসকল সেইরূপেই সন্নিবেশিত করিয়াছি। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণে উৎসাহ প্রদানকরিলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা।
মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রীট্, নং ৭৭।
১৮৮২।

শ্রীভুবনমোহন সরকার।

উপক্রমণিকা

মনুষ্যের শরীর-অপেক্ষা বহুমূল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই। বিদ্যা, ধন, মান, যশঃ, বিভব প্রভৃতি সাংসারিক যে কোন সুখ, সকলই স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, এতাদৃশ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে আমরা সম্যগ্‌রূপে যত্নবান্ নহি। অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে সকলেরই আন্তরিক বাসনা, কিন্তু কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে ও দীর্ঘ আয়ু হয়, তাহা অনেকে জ্ঞাত নহেন, অথবা জ্ঞাত হইয়াও সে নিয়মানুসারে চলিতে অবহেলা করিয়া থাকেন।

কেহ অজ্ঞতার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষায় অক্ষম, কেহ বা বিজ্ঞ হইয়াও সাংসারিক নানাবিধ কারণপরবশে তাহার বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য হন, কেহ বা তাহা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া অনাদর করেন, এবং কেহ বা স্বভাবের প্রতি সমস্ত ভার অর্পিত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

শরীরের স্বাস্থ্য কি এবং তাহা কি পরিমাণে প্রয়োজনীয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু তাহা কি নিয়মে পরিরক্ষিত হয়, তাহা সাধারণের বিজ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক,

অনেক সুশিক্ষিত সভ্য জাতির মধ্যেও এপর্য্যন্ত এবম্বিধ বিদ্যা আলোচনা হয় নাই, যাহাতে তাঁহারা সকলেই নৈসর্গিক বিধানের অনুযায়ী শরীর পালনে সমর্থ হইতে পারেন। অন্য জাতি অপেক্ষা আমাদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে এত শিথিলত দেখা যায়, তাহার মূলকারণ অপরিজ্ঞতা। যদিও পূর্ব্বাপেক্ষ আমাদিগের দেশে বিদ্যার অধিকতর চর্চ্চা হইতেছে, তথাপি আমাদিগের লোকসংখ্যার সহিত উহার সমতুলন সর্ব্বথা সম্ভবিত হইতে পারে না, কারণ আমাদের দেশে কৃতবিদ্য কিম্বা শিক্ষিতনামধারী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক পরিমানে অল্প। অন্ধকারাবৃত রজনীতে একটী খদ্যোতিকার দীপ্তি অতি সামন্য বলিয়া যাদৃশ প্রতীতি হয়, আমাদিগের মধ্যে বিদ্যার জ্যোতিও তাদৃশ অনুমিত হইয়া থাকে। বাহ্যবস্তুর সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানশিক্ষার অপেক্ষা করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন,—"শরীর পালন করিয়া আর কি হইবে? যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, অদৃষ্টের লিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না। বিশুদ্ধ বায়ু সেবনই কর, বিমল জল পানই কর, আর উত্তম খাদ্যই বা ভক্ষণ কর, রোগ যখন হইবে, তখন কোন উপায়েই তাহা নিবারিত করিতে পারিবে না,—ও সকল কেবল বৃথা আকিঞ্চন মাত্র।" ইহারা রোগাক্রান্ত হইলে, "অদৃষ্টই তাহার মূলকারণ" বলিয়া মনস্তাপ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা জ্ঞানবান্, বিশেষতঃ যাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসকল অবগত আছেন, তাঁহারাও যে অনেক সময়ে সাংসারিক বহুবিধ কারণবশতঃ স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়। কেহ বিষয়কর্ম্মের অনুরোধে অসময়ে স্নান, অসময়ে আহার, অনর্থক শ্রম, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়াকর অত্যাচার করিয়া থাকেন; কেহ বা অবস্থার সঙ্কীর্ণতা-নিবন্ধন শরীরের শুভপ্রদ নিয়মসমূহ প্রকৃতরূপে পালন করিতে অশক্ত হন; কেহ বা বিষতুল্য মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহারের বশীভূত হইয়া স্বাস্থ্যের প্রতি জলাঞ্জলি দেন; কেহ বা বিজ্ঞানব্রতসাধনে মস্তিষ্কের যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিয়া শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত করেন।

অনেকে ব্রতাদির উপলক্ষে শরীরকে যথেষ্ট ক্লেশ দিয়া থাকেন। ঈদৃশ ব্যবহার আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকবর্গের মধ্যেই অধিক পরিমাণে সংলক্ষিত হয়। ইহাঁরা বার, ব্রত, পর্ব্ব, যজ্ঞ ইত্যাদির উপলক্ষে প্রভূত শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন।

কেহ বা ঔদাসীন্য-প্রযুক্ত শরীর সংরক্ষণে বিরত হন; কেহ বা স্বভাবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় নিশ্চেষ্ট থাকেন।

যে কোন কারণেই হউক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নৈসর্গিক বিধানানুসারে স্বাস্থ্য রক্ষা করা দূরে থাকুক, আমরা কুসংস্কারপূর্ণ সমাজের বিষময় বিধির অধীন ও চিরাগত ব্যবহারদোষে বিদূষিত হইয়া, উহার অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হই।

সাবধানতা যে কি বস্তু, তাহা আমাদিগের দেশের লোকে তাদৃশ অনুভব করেন না। সাবধানে থাকিলে যে অনে রোগ ও বিপৎ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, তাহাতে আ সংশয় কি? কোন ব্যামোহ বা আপৎ হইতে মুক্ত হওয়া অপেক্ষ তাহাকে উপস্থিত না হইতে দেওয়াই বিচক্ষণতার কার্য আরোগ্য-অপেক্ষা পূর্ব্বে পরিহার অধিকতর শ্রেয়স্কর, তা কোন্ পণ্ডিতেরই না স্বীকার্য্য?

কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন যে, ব্যাধির আশঙ্কা শরীরের এত দাসত্ব স্বীকার করা নিতান্ত ভীরুতার কর্ম্ম। রো উপস্থিত হইলে, চিকিৎসকেরা আরোগ্য করিবেন, তাহ নিমিত্ত এত সতর্কতার প্রয়োজন কি? বোধ হয়, ইহাঁদে মতে অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ না করিয়া, উহা হস্তান্তর হইলে, পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত পুলিসের উপর নির্ভ করিয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। অর্থাদি-সম্পত্তি-সম্প শেষোক্ত যুক্তি যেরূপ অসঙ্গত, আমাদের শরীররূপ সম্পত্তি পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিও সেইরূপ বলিতে হইবে। অতএ স্বাস্থ্যরক্ষা অর্থাৎ শরীরের সুস্থতাপরিরক্ষণবিষয়ে আমাদে সকলেরই সর্ব্বতোভাবে অধ্যবসায়সম্পন্ন হওয়া বিধেয়।

CONTENT

Page.

INTRODUCTION.

CHAPTER I.

Brief description of the tissues of the body.

Skin ... ...
Fat ... ...
Muscles ... ...
Blood Vessels ... ...
Bones ... ...
Cartilage ... ...
Brain ... ...
Spinal Cord and Nerves...

CHAPTER II.

Physiology of

Digestion 8
Circulation 20
Respiration 27
Secretion 29
Reproduction 29
Motion and Locomotion... 29
Sensation and Sensory organs 30
Organs of Speech ... 32

CHAPTER III.

Food.

Waste of Tissues ... 33
Animal Heat 35
Classification of Food ... 36
Nitrogenous Principles of Food 37
Non-nitrogenous Principles of Food 37
(*a*). Fats 37
(*b*). Carbo-Hydrates ... 38
Minerals 39
The Pulses 41
The Cereals 41
Rice 42
Wheat 43
Animal Food 43
Meat 43
Fish 44
Eggs 44
Milk 44
Effects of Animal and Vegetable Food compared... 45
Hunger 48
Proper amount of Food... 49
Necessity of Cooking ... 50
Times of meals 51
Varieties of Food common in this Country ... 53
Green Vegetables ... 54
Fruits 55
Sweatmeats 56
Fried grains and pulses ... 57
Cakes 57
Preserved Fruits ... 58
Condiments 58
Food of Infants 58

CHAPTER IV.

Drinks.

Thirst 61
Purity of water 63
The means of Purifying Water 64
Different kinds of Native Drinks 66
Tea and Coffee 68

	Page.
Alcoholic Drinks... ...	69
Their Varieties and effects on the system	70

CHAPTER V.

Air.

Composition of Air ...	75
Oxygen and Nitrogen ...	75
Carbonic acid	77
Sulphuretted Hydrogen...	81
Sources of foul gases and Emanations	82
Effects of breathing an impure atmosphere ...	83
Ventilation	85

CHAPTER VI.

Habitation.

Their Varieties and Construction	90
Privies and the means of removing nightsoil ...	93
Lying-in-rooms	95
Sanitation of the town or village we live in ...	96
Deodorants and Disinfectants	98

CHAPTER VII.

Personal cleanliness ...	100
Sweat	103
Bathing	104
Clean clothing	108

CHAPTER VIII.

	Page.
Clothing	109

CHAPTER IX.

Exercise	113
Effects of exercise on the different organs of the body	114
Exercise of students ...	117
Exercise of children ...	119
Kinds of Exercise ...	120

CHAPTER X.

Sleep	121
Dreams	122
Quantity of sleep ...	124
Proper time for sleep ...	128
Circumstances conducive to sound sleep	129

CHAPTER XI.

Health of mind	133

CHAPTER XII.

Smallpox	138
Cholera	142
Malarious Fever	143

CHAPTER XIII.

Registration of Births and Deaths	145

সূচীপত্র

—০:০—

		পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	... ...	।/০
১—অধ্যায়— শরীরনির্ম্মাণোপযোগী উপকরণ		১— ৭
২— ঐ — শারীরিক ক্রিয়া	... ...	৭— ৩৩
৩— ঐ — খাদ্য	... ...	৩৩— ৬১
৪— ঐ — পানীয়	... ...	৬১— ৭৪
৫— ঐ — বায়ু	... ...	৭৪— ৯০
৬— ঐ — বাসগৃহ	... ...	৯০—১০০
৭— ঐ — পরিচ্ছন্নতা	... ...	১০০—১০৮
৮— ঐ — পরিধেয়	... ...	১০৯—১১৩
৯— ঐ — পরিশ্রম	... ...	১১৩—১২১
১০— ঐ — নিদ্রা	... ...	১২১—১৩৩
১১— ঐ — মনোবৃত্তি	... ...	১৩৩—১৩৮
১২— ঐ — বসন্ত, ওলাউঠা ও জ্বর	...	১৩৮—১৪৫
১৩— ঐ — জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যানির্ণয়	...	১৪৫—১৪৭

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

শরীরনির্ম্মাণোপযোগী উপকরণ।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, আমাদিগের দেহ যে সকল উপকরণে গঠিত এবং যে সকল ক্রিয়ার-দ্বারা জীবন সংরক্ষিত হয়, তাহার বিষয় অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

শরীরের প্রধান ক্রিয়া তিনটী;—১ নিঃশ্বাস, ২ পান এবং ৩ আহার।

নিঃশ্বাস বায়ু-দ্বারা, পান জল-দ্বারা এবং আহার খাদ্য-দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই তিন প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে যে কোন একটীর অভাব হইলেই জীবন নষ্ট হয়।

১ নিঃশ্বাস।—বায়ুর অভাব হইলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য বন্ধ

হইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত পৃথিবীমণ্ডলের সকল স্থলেই বায়ু এত প্রচুর প্রমাণে পরিব্যাপ্ত আছে যে, জীবমাত্রকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও উহার অভাব অনুভব করিতে হয় না।

২ পান।— জল-ব্যতিরেকে পিপাসা সহ্য করিয়াও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারা যায় বলিয়া, বায়ুর অপেক্ষা জলের ভাগ অল্পতর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়।

৩ আহার।— পান-অপেক্ষাও জীব আহার ব্যতীত অধিকতম কাল জীবিত থাকিতে সমর্থ হয়, এই জন্যই আহারীয় দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্ল্লভ এবং অধিক যত্নে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

অতএব নির্ম্মল বায়ু, পরিষ্কৃত জল, শরীরপরিপোষক খাদ্য প্রভৃতিই স্বাস্থ্যভোগের প্রধান কারণ বলিতে হইবে। এক্ষণে বায়ু, জল, খাদ্য ইত্যাদির কি গুণ, কি প্রকারেই বা তাহারা আমাদিগের জীবন পরিরক্ষণের হেতুভূত, কি নিয়মে প্রযোজ্য এবং কোন্ অবস্থায় ব্যবহার্য্য—এ সকল বিষয় বিচার করিবার অগ্রে, আমাদিগের দেহ কি কি উপকরণে বিনির্ম্মিত, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

শরীর চর্ম্ম, মাংস, অস্থি প্রভৃতি পদার্থে সংগঠিত।—

চর্ম্ম।—শরীরের সর্ব্বোপরি আচ্ছাদনের নাম চর্ম্ম। ইহা-দ্বারা স্পর্শজ্ঞান জন্মে ও শরীরের মলা ঘর্ম্মাকারে নির্গত হয়। চর্ম্ম দুইটি প্রধান স্তরে নির্ম্মিত,—বাহ্যিক স্তরটি অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং নিম্ন স্তরটি কোমল ও বহুসংখ্যক শিরায় পরিপূর্ণ।

নিম্ন স্তরের মধ্যে ও নিম্নে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতি ঘর্ম্মযন্ত্র, তৈল-যন্ত্র; ও লোমকূপ বিস্তৃত আছে।

প্রত্যেক ঘর্ম্মযন্ত্রহইতে একটী সূক্ষ্মনালী চর্ম্মের বাহ্যস্তর ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। এই নালীর বাহ্যচ্ছিদ্রের নাম স্বেদচ্ছিদ্র। এই স্বেদচ্ছিদ্রের ভিতর দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হয়। করতলের এক বর্গইঞ্চ-পরিমিত চর্ম্মে প্রায় ২৭৩৬টি স্বেদচ্ছিদ্র লক্ষিত হয়, কিন্তু চর্ম্মের সকল স্থানে উহার সংখ্যা সমান নহে। একজন যুবা ব্যক্তির সমস্ত চর্ম্মে প্রায় ৭০ লক্ষ স্বেদচ্ছিদ্র আছে।

চর্ম্মস্থতৈলযন্ত্র হইতে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া কেশ ও চর্ম্মের চাকচিক্য বৃদ্ধি করে। ইহা মস্তক, মুখ ও শরীরের গ্রন্থিস্থানে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

বাহ্যস্তরে এক প্রকার বর্ণময় পদার্থ আছে, যাহা-দ্বারা দেশ-বিশেষে চর্ম্মের বর্ণ কৃষ্ণ, শ্যাম, গৌর বা শ্বেত হইয়া থাকে। শীত-প্রধানদেশবাসিদিগের চর্ম্ম সচরাচর শ্বেতবর্ণ, গ্রীষ্মপ্রধানদেশ-বাসিদিগের কৃষ্ণবর্ণ এবং সমশীতোষ্ণদেশীয়দিগের মিশ্রবর্ণ হইয়া থাকে। চর্ম্ম কোমল ও স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট। চর্ম্ম যে পদার্থ, নখ এবং কেশও সেই পদার্থ, অর্থাৎ উহা চর্ম্মের রূপান্তরমাত্র।

বসা।—চর্ম্মের নিম্নে একবিধ তৈলবৎ সুকোমল পদার্থ আছে, তাহার নাম বসা, চলিতভাষায় উহাকে চর্ব্বি বলে। উহা পুরুষ-অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীরে অধিকতর পরিমাণে থাকে, এই নিমিত্ত স্ত্রীলোকের শরীর পুরুষের অপেক্ষা অধিক-তর সুকুমার পুষ্ট এবং চিক্কণ। দেহ কৃশ হইলে, অপেক্ষাকৃত

শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে বসার হ্রাস হইয়া থাকে এবং ইহারই অভাবে শরীর ক্ষীণ ও লাবণ্যবিহীন হইয়া যায়।

মাংস।—চর্ম্ম এবং বসার নিম্নে মাংস। মাংস কোমল ও রক্তবর্ণ এবং দুই শেষ ভাগে অস্থির সহিত সংলগ্ন। মাংসের একটি প্রধান গুণ এই যে, উহা টানিলে সহসা ছিন্ন হয় না।

মাংসপেশী।—বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম মাংসসূত্র একত্রিত হইয়া একটী মাংসপেশী হয়। মাংসপেশীর মধ্যভাগ প্রায় স্থূল এবং দুই প্রান্ত ক্রমে রজ্জুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া অস্থিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়। স্থানবিশেষে মাংসপেশী চেপ্টাও হইয়া থাকে। অস্থিদ্বয়ের গ্রন্থিস্থলে মাংসপেশীর এক প্রান্ত এক অস্থিতে ও অন্য প্রান্ত অন্য অস্থিতে সংলগ্ন থাকে। মাংসপেশীর প্রয়োজন-অনুসারে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ গুণ থাকায় হস্ত-পদ-প্রভৃতি অঙ্গের পরিচালনা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শারীরিক বল মাংসপেশীর উপরে নির্ভর করে। যাহারা পরিশ্রমী এবং সর্ব্বদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করে, তাহাদিগের মাংসপেশী পুষ্ট ও বলবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মাংসপেশী দুই প্রকার;—ইচ্ছাধীন ও স্বাধীন।

ইচ্ছাধীনমাংসপেশী।—আমরা ইচ্ছা করিলেই যে সকল মাংসপেশীর পরিচালনা করিতে পারি, সেই সকলের নাম ইচ্ছাধীনমাংসপেশী। স্বাধীনমাংসপেশী।—হৃদয়, ফুস্ফুস্, পাকযন্ত্র ইত্যাদি শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহ যে সকল মাংসপেশীদ্বারা নির্ম্মিত এবং যাহারা ইচ্ছানুযায়িক চালিত না হয়, তাহাদিগেরই নাম স্বাধীনমাংসপেশী।

রক্তবাহিনীনালী।— মাংস, বসা, চর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের নিমিত্ত যে সকল নালী শরীরের সকল স্থলেই বিস্তৃত আছে, তাহাদিগের নাম রক্তবাহিনী নালী, চলিত ভাষায় ইহাদিগকে শির বলে। রক্তবাহিনী নালী দুই প্রকার;—বিশুদ্ধশোণিতবাহিনী ও বিদূষিতশোণিতবাহিনী।

বিশুদ্ধশোণিতবাহিনী নালীকে ধমনী বলে এবং বিদূষিত-শোণিতবাহিনী নালীকে শিরা বলে। ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

অস্থি।—মাংসের নিম্নে অস্থি। অস্থি শ্বেতবর্ণ ও অতি কঠিন পদার্থ। ইহা শৈশবাবস্থায় অপেক্ষাকৃত কোমল থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার কাঠিন্য ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিতহইতে থাকে। অস্থিসকল গ্রন্থিদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। ইহাদ্বারা শরীরের গঠন নির্দ্দিষ্ট হয় এবং আমরা ভার বহন করিতে সমর্থ হই। এই-সংযুক্ত অস্থি-আকারকে কঙ্কাল বলে। প্রতিমার পঞ্জর (কাটাম) যাদৃশ কাষ্ঠে রচিত, শরীরের কঙ্কালও তাদৃশ অস্থিতে নির্ম্মিত। মস্তিষ্ক, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি অন্যান্য কোমল ও আবশ্যকীয় যন্ত্রসকল কতিপয় অস্থিতে পরিবেষ্টিত থাকে, এই নিমিত্ত বাহ্যিক আঘাত হইতে তাহারা সহজে সংরক্ষিত হয়। স্থানবিশেষে অস্থির আকার নানাবিধ হয়। যথা, হস্ত-পদাদির অস্থি দীর্ঘ ও সরল এবং অন্তশ্ছিদ্রবিশিষ্ট এবং মস্তক, কটিদেশ ইত্যাদি স্থানের অস্থি পাত্‌লা এবং চেপ্‌টা।

মজ্জা।—অস্থির ভিতরে যে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ আছে, তাহাকে মজ্জা বলে।

উপাস্থি।— গ্রন্থিস্থলে সংযুক্তঅস্থিদ্বয়ের প্রান্তভাগ স্থূল এবং এক প্রকার কোমল ও মসৃণ অস্থিদ্বারা আবৃত, ইহার নাম উপাস্থি। কর্ণ, নাসিকা, পঞ্জরাস্থি প্রভৃতির কিয়দ্‌ভাগও এই উপাস্থি-নির্ম্মিত।

গ্রন্থিস্থলে এই উপাস্থি-আবৃত অস্থিদ্বয়ের মধ্যে এক প্রকার তৈলময় পদার্থ সর্ব্বদা সঞ্চিত হয়, যাহা-দ্বারা ঘর্ষণকার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক।—মস্তকের মধ্যে এক প্রকার ঘৃতবৎ শ্বেতবর্ণ গাঢ় পদার্থ আছে, উহার নাম মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্ক মনের যন্ত্রের স্বরূপ; ইহা হইতেই সকল প্রকার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্কহইতে কতকগুলি শাখাস্নায়ু বহির্গত হইয়া হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌, পাকযন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রবিশেষে প্রবেশ করে।

স্নায়ুরজ্জু।— মস্তিষ্কের নিম্নভাগহইতে যে অংশ দীর্ঘভাবে মেরুদণ্ডের* মধ্যে অবস্থিতি করে, তাহার নাম স্নায়ুরজ্জু। এই স্নায়ুরজ্জু মস্তিষ্কের প্রধান শাখা। ইহা মস্তিষ্কের নিম্নভাগ হইতে ক্রমে রজ্জুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া মেরুদণ্ডের শেষ সীমায় গমন করে। আবার স্নায়ুরজ্জুর দুই পার্শ্ব হইতে কতকগুলি রজ্জুর আকৃতি শ্বেতবর্ণ শাখাস্নায়ু বহির্গত ও অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরের সকল স্থানে বিস্তারিত আছে।

---

* যে অস্থিমালা ঊর্দ্ধাধোরূপে আয়ত হইয়া পৃষ্ঠের মধ্যভাগে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার নাম মেরুদণ্ড।

মনের ইচ্ছানুসারে এই সকল স্নায়ুদ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা হইয়া থাকে। এই সকল স্নায়ুর সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা চর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। আর মস্তিষ্কহইতে ভিন্ন ভিন্ন শাখাস্নায়ুর সংযোগে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তার যে রূপ তাড়িতের বলে দূরাদূর সংবাদ বহন করে, এই সকল স্নায়ুও সেইরূপ তাড়িতবৎ এক প্রকার পদার্থের সাহায্যে আমাদিগের বাহ্যজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা এই সকল স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে বিজ্ঞাপিত হইলেই, মনে তাহার উদ্বোধ জন্মাইয়া দেয়।

এই সকল উপকরণ ব্যতীত শরীরের মধ্যে হৃদয়, শ্বাসযন্ত্র, পাকযন্ত্র, যকৃৎ প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যক যন্ত্র আছে, তাহাদিগের বিষয় ক্রমে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শারীরিকক্রিয়া।

শরীরের প্রকৃত অবস্থার নাম স্বাস্থ্য এবং বিকৃত ভাবের নাম রোগ। স্বাভাবিক অবস্থা জ্ঞাত না হইলে বিকৃত ভাব যে কি, তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় না; এই জন্য প্রথমে শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা অবগত হওয়া আবশ্যক।

শারীরিক ক্রিয়া পাঁচ প্রকার—পোষণ, পুনরুৎপত্তি, চলন, চেতন, ও বাক্য।

পোষণ।—নিঃশ্বাস, পান ও আহারের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে শরীরের যে পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম পোষণ। পোষণকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা।—

১ পরিপাক, ২ রক্তসঞ্চালন, ৩ নিঃশ্বাস, ও ৪ রক্তমন্থন।

১ পরিপাক।—জীবনরক্ষার যে কয়েকটী প্রধান ক্রিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পরিপাক একটি অতি আবশ্যকীয় ক্রিয়া। ইহা-দ্বারা ভুক্তদ্রব্য উদরস্থিত কতিপয় পাচক রসের সাহায্যে জীর্ণ হইয়া, রক্তের সহিত সংযুক্ত হইবার উপযোগী হয় এবং উহার সারাংশ রক্তের সহিত পরিণীত হইয়া, শরীরের পুষ্টিকারিতা সম্পাদন করে।

পরিপাককার্য্য আবার আট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে

পারে;—(১) গ্রহণ, (২) চর্ব্বণ, (৩) লালাসংমিশ্রণ, (৪) গিলন, (৫) পাককরণ, (৬) সারকরণ, (৭) আচূষণ ও (৮) মলত্যাগ।

(১) গ্রহণ।—মুখের মধ্যে আহারীয় দ্রব্য লওয়ার নাম গ্রহণ। মনুষ্য এবং বানর ও কাষ্ঠবিড়াল ইত্যাদি কতিপয় প্রকার জন্তু হস্ত, ওষ্ঠ, দন্ত ও কিয়ৎপরিমাণে জিহ্বাদ্বারা খাদ্যদ্রব্য মুখমধ্যে স্থাপন করে; কিন্তু অন্যান্য ইতর প্রাণির মধ্যে এই গ্রহণপ্রণালী নানাপ্রকার। গিরগিটি, কাটঠোক্‌রাপাখী ইত্যাদি কোন কোন জন্তু কেবল তাহাদিগের দীর্ঘরসনাদ্বারা এই কার্য্য সমাধা করে। হস্তী তাহার দীর্ঘাকার শুণ্ডদ্বারা সকলপ্রকার খাদ্যদ্রব্য মুখের মধ্যে স্থাপিত করে। গাভী, ছাগ প্রভৃতি জন্তুসকল তাহা-দিগের স্থূল ওষ্ঠদ্বারা তৃণপল্লবাদি ধারণ করিয়া মুখের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করায়। পক্ষিসকল চঞ্চুদ্বারা আহার গ্রহণ করে।

(২) চর্ব্বণ।—চর্ব্বণকার্য্য মুখমধ্যে দন্তদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। চর্ব্বিতদ্রব্য জিহ্বাদ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয় এবং ওষ্ঠ ও গণ্ডদ্বয়দ্বারা মুখমধ্যে আবদ্ধ থাকে।

দন্ত। চর্ব্বণকার্য্যের প্রধান যন্ত্র দন্ত। মনুষ্য এবং অধি-কাংশ স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের দন্ত দুই প্রকার, পতনশীল ও স্থায়ী।

পতনশীল-দন্ত। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে আমাদিগের যে দন্তশ্রেণী বিনির্গত হয়, তাহাদিগের নাম পতনশীল-দন্ত, কারণ সে গুলি কিছু দিনের মধ্যে পড়িয়া যায়। এরূপ দন্তের সংখ্যা ২০টী মাত্র;— ঊর্দ্ধচিবুক-অস্থিতে সংলগ্ন ১০টী ও নিম্নচিবুক-অস্থিতে ১০টী।

স্থায়ি-দন্ত। পতনশীল-দন্ত-সমূহের পতনান্তে যে নূতন দন্ত-

শ্রেণী বহির্গত হয়, তাহাদিগের নাম স্থায়ি-দন্ত। এরূপ দন্তের সংখ্যা ৩২টী,—ঊর্দ্ধচিবুক-অস্থিতে ১৬টী এবং নিম্নচিবুক-অস্থিতে ১৬টী আবদ্ধ থাকে।

কার্য্যবিশেষে দন্তের নাম ও গঠন ভিন্ন প্রকার;—ছেদক, মাংসচ্ছেদক ও পেষক। ছেদক-দন্তের সংখ্যা ৮টী, উপর পংক্তির সম্মুখে ৪টি ও নীচের পংক্তির সম্মুখে ৪টী, ইহাদের অগ্রভাগ পাতলা, চেপ্টা ও তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট। মাংসচ্ছেদক-দন্ত ৪টী, উপরে ২টি ও নীচে ২টি, ইহারা ছেদক-দন্তসমূহের দুই পার্শ্বে স্থিত এবং অগ্রভাগ সরু ও বিলক্ষণ ধারযুক্ত। অবশিষ্ট ২০টি দন্তের নাম পেষক, উপরে ১০টি ও নীচে ১০টি; ইহাদের অগ্রভাগ স্থূল ও প্রশস্ত। এই ২০টি পেষক-দন্তের মধ্যে ৪টি সর্ব্বপার্শ্বের দন্ত বয়ঃক্রম- কালে বহির্গত হয়, ইহাদিগকে "জ্ঞানদন্ত" বলে।

পতনশীল-দন্ত।

	পেষক	মাংসচ্ছেদক	ছেদক	মাংসচ্ছেদক	পেষক		
উপরে	২	১	৪	১	২	=১০	=২০
নীচে	২	১	৪	১	২	=১০	

স্থায়ি-দন্ত

	পেষক	মাংসচ্ছেদক	ছেদক	মাংসচ্ছেদক	পেষক		
উপরে	৫	১	৪	১	৫	=১৬	=৩২
নীচে	৫	১	৪	১	৫	=১৬	

নিম্নচিবুক-অস্থির সঞ্চালনদ্বারা উভয় পংক্তির দন্ত পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া চর্ব্বণকার্য্য সম্পাদিত হয়। আহারীয়দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে চর্ব্বিত হইবে, ততই উহা বিশেষরূপে চূর্ণ ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাকোপযোগী হইবে। এই নিমিত্ত তাড়াতাড়ী ভোজন করা অবিধেয়।

(৩) লালাসংমিশ্রণ।—চর্ব্বণদ্বারা ভুক্তদ্রব্য পেষিত ও মুখস্থিত লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া পিণ্ডবৎ ও গিলনোপযোগী হয়। মুখের মধ্যে ছয়টি লালাযন্ত্র আছে। লালাযন্ত্রহইতে এক প্রকার জলবৎ তরল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া সূক্ষ্মনালীদ্বারা মুখ-মধ্যে পতিত হয়। ইহাব্যতীত গণ্ডস্থিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র যন্ত্র-হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়। এই দুই রসকেই লালা বলে। লালা ঈষৎ লবণাক্ত। উহা সর্ব্বদাই মুখমধ্যে ক্ষরিত হয়, কিন্তু অন্য সময়ের অপেক্ষা আহারকালে অধিকতর পরিমাণে নিঃসৃত হয়। লালার বিশেষ রাসায়নিক গুণ এই যে, উদ্ভিজ্জ-আহারীয় দ্রব্যের শ্বেতসার অর্থাৎ পালো (Starch) যাহা সহজে দ্রব হয় না, লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া শর্করায় পরিণত হয়: এবং এই শর্করা অতি সহজেই দ্রবীভূত হয়। এই নিমিত্ত পরিপাককার্য্যে লালা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(৪) গিলন।—আহার্য্যদ্রব্য মুখহইতে গলাধঃকৃত হইয়া পাক-স্থলীতে যাওয়ার নাম গিলন। মুখের পশ্চাৎ ও নিম্নভাগে যে পথদিয়া ভক্ষ্যদ্রব্য উদরমধ্যে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, উহার নাম অন্ননালী। মুখ ও অন্ননালীর মধ্যে কোমল তালুসংলগ্ন একটী ক্ষুদ্রজিহ্বা আছে, উহার সাধারণ নাম আলজিব। আল-জিব দ্বারের কবাটের ন্যায় মুখ এবং অন্ননালীর মধ্যে থাকিয়া, চর্ব্বিতদ্রব্য গিলনোপযোগী না হইলে, অন্ননালীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেয় না। ইহাদ্বারা নাসিকার অন্তশ্ছিদ্রও বদ্ধ থাকে এবং গিলনকালে ভক্ষ্যদ্রব্য নাসিকারন্ধ্রে আসিতে পারে না।

অন্ননালী অন্য সময়ে প্রায় লিপ্ত থাকে, আর ভক্ষ্যদ্রব্য

গলাভ্যন্তরে পতিত হইলেই স্ফীত হইয়া উঠে। উহার মাংস-পেশীর সঙ্কোচনদ্বারা ভুক্তদ্রব্য ক্রমে পাকস্থলীতে উপনীত হয়। অন্ননালীর দ্বারের সম্মুখে শ্বাসনালীর দ্বার। এই দ্বার একটি উপাস্থিনির্ম্মিত পরদাদ্বারা রক্ষিত আছে। শ্বাসনালীর দ্বার নিঃশ্বাসকার্য্যের নিমিত্ত সর্ব্বদা খোলা থাকে, কেবল গিলন-কালে ভুক্তদ্রব্য উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য ঐ সময় শ্বাসনালীর দ্বার ঐ পরদাদ্বারা বদ্ধ হইয়া যায়। কোন গতিকে ভুক্তদ্রব্যের কোন অংশ শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিলেই কাশ উপস্থিত হয়। ইহাকেই "বিষম লাগা" বলে।

(৫) পাককরণ।—এই কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে পাকস্থলীতে এবং সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র-অন্ত্রে সম্পাদিত হয়। অন্ননালী, বক্ষঃ ও উদর-মধ্যচ্ছেদক-মাংসপেশী ভেদ করিয়া উদরমধ্যে যাইয়া একটী স্থলীতে শেষ হয়। এই স্থলীকে পাকস্থলী বলে। পাকস্থলী উদর-মধ্যচ্ছেদক-মাংসপেশীর নিম্নে এবং উদরের উপরিভাগে ও ঈষৎ বামপার্শ্বে স্থিত। অল্পস্ফীত অবস্থায় ইহার পরিমাণ প্রায় ১২ ইঞ্চ লম্বা এবং ৪ ইঞ্চ স্থূল। পাকস্থলী স্বভাবতঃ অত্যন্ত সঙ্কোচন ও স্ফীতশক্তিসম্পন্ন।

আমাশয়িক-রস। ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে উপস্থিত হইলেই উহার গাত্রহইতে যে একপ্রকার জলবৎ অম্লরস নির্গত হইয়া ঐ সকল দ্রব্যকে পরিপাক করিতে থাকে, তাহার নাম আমা-শয়িক-রস। ইহা পাকস্থলীর গাত্রস্থিত বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম যন্ত্র হইতে উৎপন্ন হয়। আহারদ্বারা পাকস্থলী উত্তেজিত হইলেই ইহা নিঃসৃত হয়, নচেৎ অন্য সময়ে হয় না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা

বিশেষ পরিক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই রস রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা দ্রব্যবিশেষকে দ্রব করিয়া ফেলে এবং ইহার এই পাচিকাশক্তি যে কেবল পাকস্থলীর মধ্যেই প্রকাশ পায় এমন নহে, যথাযোগ্য উত্তাপসংযোগে শরীরের বাহিরেও হইতে পারে। কোন প্রাণীর আমাশয়িক-রস একটি ভাণ্ডের মধ্যে রাখিয়া, তাহার আহার্য্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য তাপ সংযোগ করিলে, ঐ আহারীয় দ্রব্য দ্রবীভূত হয়। এই রস অম্ল এবং ইহাতে লবণ-সংযুক্ত মহাদ্রাবক (Hydrochloric acid) আছে।

পাকস্থলীর দুইটি দ্বার আছে,—উপরের দ্বার অন্ননালীর সহিত সংযুক্ত ও ভুক্তদ্রব্য প্রবেশের পথ, এবং নিম্নদ্বার ক্ষুদ্র-অন্ত্রে সংযুক্ত ও খাদ্যদ্রব্যের বহির্গমনের পথ। ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে উপস্থিত হইবামাত্র, উহা বারম্বার একদিকহইতে অন্যদিকে চালিত ও ঘূর্ণিত হইতে থাকে, এবং এই সময় পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র-অন্ত্রের মধ্যে যে দ্বার আছে, তাহা রুদ্ধ থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্তদ্রব্য দ্রব হইয়া ঘন কর্দ্দমের ন্যায় রূপান্তরিত না হয়, ততক্ষণ উহার কোন অংশ ক্ষুদ্র-অন্ত্রে যাইতে পারে না।

মার্টিননামক একব্যক্তি বন্দুকের গুলির দ্বারা আহত হইলে, ঐ গুলি তাহার পাকস্থলী ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ডাক্তার বোমণ্ট এই ব্যক্তিকে ছয়মাস চিকিৎসা করেন এবং সেই সুযোগে অনেক পরীক্ষাদ্বারা পাকক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। আমাশয়িক-রস যে পাকস্থলীহইতে নিঃসৃত হয় এবং ভুক্তদ্রব্য যে উহার মধ্যে আন্দোলিত হয়, তাহা

তিনি ঐ ছিদ্রদ্বারা দর্শন করিয়া স্থির করেন। তিনি ইহাও মীমাংসা করিয়াছেন যে, জল ও অন্যান্য পানীয়দ্রব্য পাচকরসের দ্বারা পরিবর্ত্তিত না হইয়া ঐ অবস্থাতেই পাকস্থলীর গাত্রস্থিত সূক্ষ্ম-রক্তশিরাদ্বারা শোষিত হয়। এই জন্যই পানীয়দ্রব্য উদরস্থ হইবার অব্যবহিত পরেই মূত্র বা ঘর্ম্মরূপে শরীরহইতে নির্গত হইয়া থাকে। মাংস, দুগ্ধ, ডিম্ব, গোধূমসার ইত্যাদি দ্রব্যসকল আমাশয়িক-রসে উত্তমরূপে পরিপাক হয়। শর্করা বা শ্বেতসার দ্রবীভূত করিবার ইহার ক্ষমতা নাই। বসা প্রভৃতি তৈলবৎ পদার্থ পাকস্থলীতে সূক্ষ্মরূপে বিভক্ত হয় মাত্র, কিন্তু ঐ অবস্থাতেই ক্ষুদ্র-অন্ত্রে প্রবেশ করে; ইহাদের জীর্ণ করিবার ক্ষমতা আমাশয়িক-রসের নাই। বোমণ্ট সাহেব আরও স্থির করিয়াছেন যে, সুস্থ অবস্থায় আমিস ও নিরামিস সংযুক্ত দ্রব্যাদি পূর্ণমাত্রায় আহার করিলে, উহা পাকস্থলীতে কর্দ্দমের ন্যায় পিণ্ডবৎ হইতে প্রায় একঘণ্টা লাগে এবং পাক-স্থলী ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র-অন্ত্রে আসিতে প্রায় ২৷৷০ ঘণ্টাকাল বিলম্ব হয়। তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সকল দ্রব্য হইতে অন্ন অতি শীঘ্র অর্থাৎ একঘণ্টার মধ্যে দ্রব হইয়া কর্দ্দমের ন্যায় হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি দ্রব্যসকল ২ হইতে ৩ ঘণ্টার কম জীর্ণ হয় না, কিন্তু সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ-দ্রব্য-অপেক্ষা মাংস শীঘ্র দ্রব হয়। ইহার আর এক গুণ এই যে, ইহা দুর্গন্ধনাশক এবং মাংসকে শীঘ্র পচিতে দেয় না।

এইরূপে ভুক্তদ্রব্য দ্রবীভূত হইলে উহার কিয়দংশ সারভাগ পাকস্থলীসংলগ্ন অসংখ্য শিরাদ্বারা শোষিত হইয়া রক্তে

পরিণত হয় এবং অবশিষ্ট পিণ্ডবৎ পদার্থ ক্ষুদ্র-অন্ত্রে প্রবেশ করে। এই ক্ষুদ্র-অন্ত্রে নানারসের দ্বারা মিশ্রিত হইয়া উহার পরিপাককার্য্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

(৬) সারকরণ।— পাকস্থলীর দক্ষিণ শেষভাগ ক্রমে সরু হইয়া ক্ষুদ্র-অন্ত্রে মিলিত আছে। যে লম্বা ও নলাকৃতি নাড়ী-সকল উদরমধ্যে পরস্পর জড়িতভাবে অবস্থিত আছে, তাহাদের নাম অন্ত্র। ইহাকে সচরাচর আমরা "নাড়ী-ভুঁড়ী" বলিয়া থাকি। ইহা প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত,—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র। ক্ষুদ্র-অন্ত্র প্রায় ২০ ফুট্ লম্বা এবং বৃহৎ-অন্ত্র প্রায় ৫ বা ৬ ফুট্ লম্বা।

পক্বাশয়। ক্ষুদ্র-অন্ত্রের প্রথম ভাগের নাম পক্বাশয়, ইহার পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুলি বা দশ ইঞ্চমাত্র। পাকস্থলী হইতে ভুক্ত-দ্রব্য এই পক্বাশয়ে আসিয়া তিন প্রকার রসের দ্বারা মিশ্রিত হয়। এই তিন প্রকার রসের নাম পিত্ত, ক্লোমরস এবং পক্বাশয়রস।

যকৃৎ। উদরের উপরিভাগে দক্ষিণপার্শ্বে যে একটি বৃহৎ যন্ত্র আছে, তাহার নাম যকৃৎ। লম্বাভাগে ইহার পরিমাণ প্রায় ১০ হইতে ১২ ইঞ্চ এবং চওড়া প্রায় ৬ হইতে ৭ ইঞ্চ। ওজনে ইহা প্রায় ১॥০ হইতে ২ সের ভারি। ইহার গাত্রে একটী থলী সংলগ্ন আছে, উহাকে পিত্তস্থলী বলে।

পিত্ত। যকৃৎ হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহার নাম পিত্ত। ইহা উৎপন্ন হইয়া কতক একটি নলের দ্বারা পক্বাশয়ে গমন করে এবং কতক পিত্তস্থলীতে যাইয়া সঞ্চিত থাকে, আবশ্যক মত একটি স্বতন্ত্র নলের দ্বারা পক্বাশয়ে যাইয়া পরিপাক-কার্য্যে ব্যয়িত হয়। লালা ও আমাশয়িক-রসের ন্যায় সময়া-

নুসারে নিঃসৃত না হইয়া পিত্ত সর্ব্বদাই নিঃসরণ হয়, কিন্তু উপবাসকালে অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, এবং আহারের পর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়। পিত্ত হরিদ্বর্ণ, তিক্ত এবং ঈষৎ ক্ষারসংযুক্ত। এক-জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির যকৃৎ হইতে প্রায় ১৫ হইতে ২০ ছটাক পিত্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উৎপন্ন হয়।

পিত্তের দ্বারা দুইপ্রকার কার্য্য সাধন হইয়া থাকে। উহা রক্তকে সংশোধন করে এবং পাকক্রিয়ায় বিশেষ কার্য্যকর হয়। রক্তের সহিত যে অতিরিক্ত অঙ্গার (Carbon) ও উদজা-নের (Hydrogen) ভাগ মিশ্রিত থাকে, পিত্ত তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রক্তকে পরিষ্কৃত করে। গর্ভস্থ শিশুর শরীরে পিত্তের কার্য্য দৃষ্টি করিলে এইটি বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। গর্ভা-বস্থায় শিশুর নিঃশ্বাস ও পাককার্য্য স্থগিত থাকে। নিঃশ্বাস বা আহারের আবশ্যক হয় না, যেহেতু গর্ভিণীর রক্তদ্বারা শিশু প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই সময় শিশুর যকৃৎ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ থাকে এবং পিত্ত অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হয়। পাক-যন্ত্রে খাদ্যদ্রব্য না থাকায়, পিত্ত পাককার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া রক্তকে অঙ্গার ও উদজান প্রভৃতি দূষিত পদার্থহইতে পরি-শোধিত করে। অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, নিঃশ্বাসদ্বারা রক্তের যে পরিশোধন কার্য্য হইত, গর্ভাবস্থায় সেই কার্য্য যকৃৎদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পিত্ত অন্যান্য ক্লেদের সহিত শিশুর অন্ত্রে সঞ্চিত থাকে এবং ভূমিষ্ঠ হইলে পর শিশু যে কৃষ্ণবর্ণ মলত্যাগ করে, তাহা এই পিত্তভিন্ন আর কিছুই নহে।

পিত্ত পরিপাককার্য্যে বিশেষ উপকারী। ভুক্তদ্রব্য পিণ্ডবৎ

হইয়া পক্কাশয়ে আসিয়া পিত্তের সহিত সংযুক্ত হয় এবং উহার বসা প্রভৃতি তৈলবৎ অংশ এই রসে জীর্ণ হইয়া শোষণের উপযোগী হয়। পিত্তের আর এক গুণ এই যে, আমাশয়িক-রসের ন্যায় ইহারও দুর্গন্ধনাশক শক্তি আছে; ভুক্তদ্রব্য যে পর্য্যন্ত অন্ত্রের মধ্যে থাকে, কেবল এই পিত্তের গুণে উহা পচিতে পায় না। পিত্তের সারক গুণও আছে।

ক্লোম। পক্কাশয়ের বামভাগে ও পাকস্থলীর নিম্নে যে একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র আছে, তাহার নাম ক্লোম।

ক্লোম-রস। ক্লোমহইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ক্লোম-রস এবং ইহা একটি সূক্ষ্ম নলের দ্বারা পক্কাশয়ে যাইয়া ভুক্তদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। ইহা লালার ন্যায় তরল এবং লালা যেরূপ শ্বেতসারকে শর্করায় পরিবর্ত্তিত করে, ক্লোম-রসও ভুক্তদ্রব্যের যে সমস্ত শ্বেতসার লালার দ্বারা পরিবর্ত্তিত না হইয়া পক্কাশয়ে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে শর্করায় পরিবর্ত্তিত করে। ইহা ব্যতীত পিত্তের ন্যায় ক্লোম-রসও বসা প্রভৃতি তৈলবৎ পদার্থকে জীর্ণ করে।

পক্কাশয়-রস। পক্কাশয়ের গাত্রহইতে যে এক প্রকার রস নির্গত হয়, তাহাকে পক্কাশয়-রস বলে। ক্লোম-রসের যে গুণ আছে, ইহাতেও সেই গুণ আছে।

এই পাঁচটি রস, অর্থাৎ লালা, আমাশয়িক-রস, পিত্ত, ক্লোম-রস ও পক্কাশয়-রসের মধ্যে কোন একটির অভাব কিম্বা নিয়মিত ভাগের অল্পতা বা আধিক্য হইলে, পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে।

(৭) আচূষণ।— ভুক্তদ্রব্যের পিণ্ডবৎ অংশ পাকস্থলীহইতে পক্বাশয়ে উপস্থিত হইয়া এবং পিত্ত, শ্লেষ্ম ও পক্বাশয়-রসের দ্বারা পাক হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ দুগ্ধবৎ তরল ও শ্বেতবর্ণ সার-অংশ এবং অপর ভাগ ক্লেদপূর্ণ অসার পদার্থ। এই সার-অংশ ক্ষুদ্র-অন্ত্র-সংলগ্ন অসংখ্য চোষণীয় শিরাদ্বারা পরিচোষিত হইয়া ক্রমশঃ রক্তে পরিণত হয়। চোষণীয় শিরা-সমূহ একটী প্রধান রসবাহিনী শিরায় সংযুক্ত আছে। এই প্রধান রসবাহিনীশিরা মেরুদণ্ডের উপর দিয়া গমন করিয়া কণ্ঠ-নিম্নস্থ রক্তশিরার সহিত সংলগ্ন আছে। ভুক্তদ্রব্যের দুগ্ধবৎ সার-অংশ এই প্রধান রসবাহিনী শিরার মধ্যদিয়া গমন করিয়া রক্তশিরায় প্রবেশ করে।

(৮) মলত্যাগ।—যে ক্লেদপূর্ণ অসার ভাগ ক্রমে ক্ষুদ্র-অন্ত্র হইতে চালিত হইয়া বৃহৎ-অন্ত্রে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং সময়া-নুসারে শরীরহইতে পরিত্যক্ত হইয়া যায়, তাহার নাম মল।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যে যে দ্বার আছে, উহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, মল ক্ষুদ্র-অন্ত্র হইতে বৃহৎ-অন্ত্রে অনায়াসে যাইতে পারে, কিন্তু বৃহৎ-অন্ত্রে একবার প্রবেশ করিলে উহা ক্ষুদ্র-অন্ত্রে পুনরাগমন করিতে পারে না। মল বৃহৎ অন্ত্রে থাকিয়া ক্রমে নীরস ও গাঢ় হয়। পুনঃসঙ্কোচনদ্বারা কীটের অঙ্গ যেরূপ তরঙ্গের ন্যায় সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ বৃহৎ-অন্ত্রের মাংসপেশীর পুনঃসঙ্কোচনদ্বারা মল সঞ্চালিত হইয়া মলদ্বারের নিকট অগ্রসর হয়। মলদ্বার একটী অঙ্গুরীয়ের ন্যায় মাংস-পেশীদ্বারা বেষ্টিত। সঙ্কোচিত অবস্থায় মলদ্বার বদ্ধ থাকে

বলিয়া, মল আপন-ইচ্ছায় বহির্গত হইতে পারে না। মলত্যাগ আমাদিগের ইচ্ছাধীন। বিশেষ বেগদ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ-অন্ত্র, উদর এবং অন্যান্য স্থানের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করিলে মলদ্বারের মাংসপেশী বর্দ্ধিত করিয়া মল নির্গত হয়।

পাক-যন্ত্র।

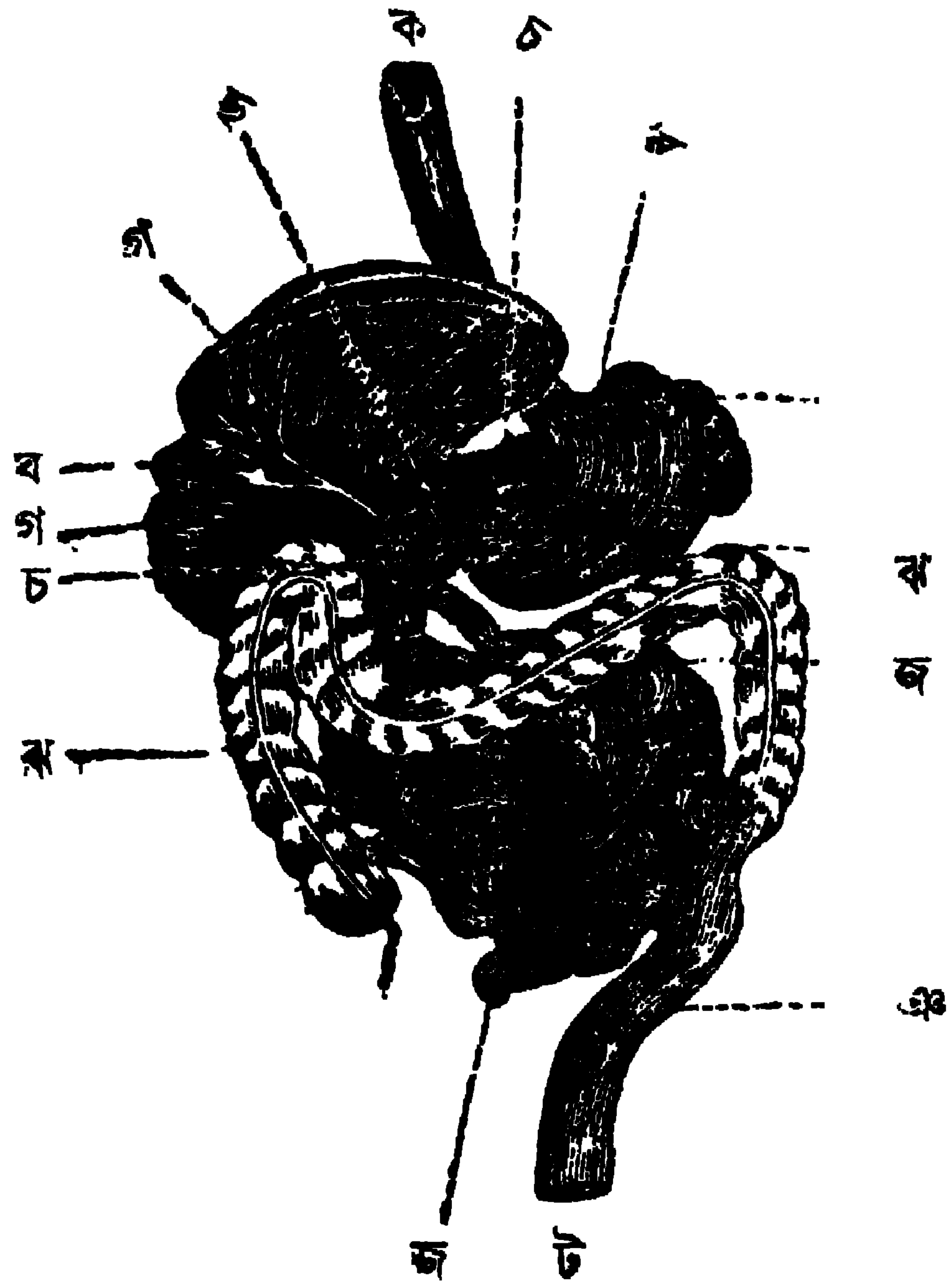

ক, অন্ননালী। খ, পাকস্থলী। গ, গ, যকৃৎ। ঘ, পিত্ত-স্থলী। ঙ, প্লীহা। চ, চ, ক্লোমযন্ত্র। ছ, পকাশয়। জ, জ, ক্ষুদ্র-অন্ত্র। ঝ, বৃহৎ-অন্ত্র। ঞ, মলাশয়। ট, মলদ্বার।

২। রক্ত-সঞ্চালন।—হৃদয়কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক রক্তবাহিকা নাড়ী-দ্বারা শরীরের সর্ব্বাংশে রক্তের গমনাগমনের নাম রক্ত-সঞ্চালন।

হৃদয়। রক্ত-সঞ্চালনের প্রধান যন্ত্র হৃদয়। রক্তবাহিনী নাড়ী-সমূহ ইহার শাখা। ইহা শরীরের সমস্ত রক্তের আধার; এই নিমিত্ত ইহাকে রক্তাশয়ও কহে।

যেমন কলিকাতার অন্তঃপাতী টালা বা বহুবাজারস্থিত "জলের কল" হইতে বাষ্পযন্ত্রের কৌশলে জল তাড়িত হইয়া বহুসংখ্যক নলের মধ্য-দিয়া, এই মহানগরের চতুর্দ্দিকে চালিত হইতেছে, সেইরূপ হৃদয়যন্ত্রহইতে উহার সঙ্কোচন-শক্তি-কর্ত্তৃক রক্ত প্রবাহিত হইয়া, অসংখ্য নাড়ীর মধ্য-দিয়া, শরীরের সকল স্থানে সঞ্চালিত হইয়া থাকে; কিন্তু রক্ত যেরূপ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধন করিয়া পুনরায় সেই হৃদয়যন্ত্রে প্রত্যাগমন করে, জল সেরূপ করে না।

হৃদয় বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে ঈষৎ বামভাগে স্থিত এবং দুই পার্শ্বে দুই ফুস্‌ফুস্‌-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। ইহার পশ্চাতে মেরুদণ্ড, সম্মুখে বক্ষঃ-অস্থি, এবং নিম্নে বক্ষঃ ও উদর-মধ্যচ্ছেদক-মাংস-পেশী। সূক্ষ্মমাংসপেশীনির্ম্মিত এবং ত্রিকোণবিশিষ্ট একটী স্থলীর ন্যায় ইহার আকৃতি। ইহার স্থূলভাগ উচ্চ দিকে এবং সূক্ষ্মভাগ নিম্ন দিকে স্থিত। হৃদয়ের পরিমাণ সচরাচর প্রায় ৪৸৹ ইঞ্চ দীর্ঘ, ৩৷৹ ইঞ্চ প্রস্থ এবং ২৷৹ ইঞ্চ স্থূল।

হৃদয় শরীরের মধ্যে একটি প্রধান যন্ত্র। ইহা বাহ্যিক আঘাত-হইতে যথোচিত রক্ষার নিমিত্ত যে জলবৎ রসপূর্ণ একটী দৃঢ় স্থলীর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহার নাম "হৃদয়কোষ"।

হৃদয় যন্ত্র চারিটি কোষ্ঠে বিভক্ত:—দুইটি গ্রাহক-কোষ্ঠ (Auricles) এবং দুইটি ক্ষেপক-কোষ্ঠ (Ventricles)।

গ্রাহক-কোষ্ঠ। যে কোষ্ঠে ধমনীহইতে অশুদ্ধ রক্ত পরিগৃহীত হয়, তাহার নাম গ্রাহক-কোষ্ঠ।

ক্ষেপক-কোষ্ঠ। যে কোষ্ঠহইতে পরিষ্কৃত রক্ত ধমনীতে ক্ষেপিত হয়, তাহার নাম ক্ষেপক-কোষ্ঠ।

দুইটি গ্রাহক-কোষ্ঠের মধ্যে একটি দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠ এবং অপরটি বাম-গ্রাহক-কোষ্ঠ। সেইরূপ দুইটি ক্ষেপক-কোষ্ঠের মধ্যে একটি দক্ষিণ-ক্ষেপক এবং অপরটি বাম-ক্ষেপক কোষ্ঠ।

হৃদয় দুই অংশে বিভক্ত, দক্ষিণ ও বাম অংশ। দক্ষিণ অংশের উপরিভাগে একটি গ্রাহক-কোষ্ঠ এবং নিম্নভাগে একটি ক্ষেপক কোষ্ঠ, এবং বাম অংশেও সেইরূপ উপরে একটি গ্রাহক-কোষ্ঠ এবং নিম্নে একটি ক্ষেপক কোষ্ঠ।

দক্ষিণ-গ্রাহক ও দক্ষিণ-ক্ষেপক কোষ্ঠের মধ্যে একটি দ্বার আছে, এবং ঐরূপ বাম-গ্রাহক ও বাম-ক্ষেপক-কোষ্ঠের মধ্যেও একটি দ্বার আছে। এই দ্বারদ্বয় এক প্রকার পাত্‌লা চর্ম্মের কবাটদ্বারা (Valves) আবদ্ধ থাকে। এই চর্ম্ম-কবাটদ্বারা রক্ত একবার এক কোষ্ঠহইতে অন্য কোষ্ঠে গমন করিলে, আর প্রথম কোষ্ঠে প্রত্যাগত হইতে পারে না। শরীরের সমস্ত অশুদ্ধ রক্ত প্রধান শিরাদ্বয়-দ্বারা বাহিত হইয়া দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠে পতিত হয়। দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠ-হইতে এই অশুদ্ধ রক্ত ফুস্‌ফুসের ধমনী দ্বারা উভয় ফুস্‌ফুসে গমন করে। সেখানে ফুস্‌ফুস্‌-মধ্যে বায়ুর সংযোগদ্বারা ঐ রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া, ফুস্‌ফুসের চারিটি শিরাদ্বারা

বাহিত হইয়া, বাম-গ্রাহক-কোষ্ঠে গমন করে। এই কোষ্ঠ-হইতে ঐ পরিষ্কৃত রক্ত বাম-ক্ষেপক-কোষ্ঠে গমন করে; এবং এই কোষ্ঠসংলগ্ন বৃহৎ-ধমনী-মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার শাখা-প্রশাখাদ্বারা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চালিত হয়।

হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌।

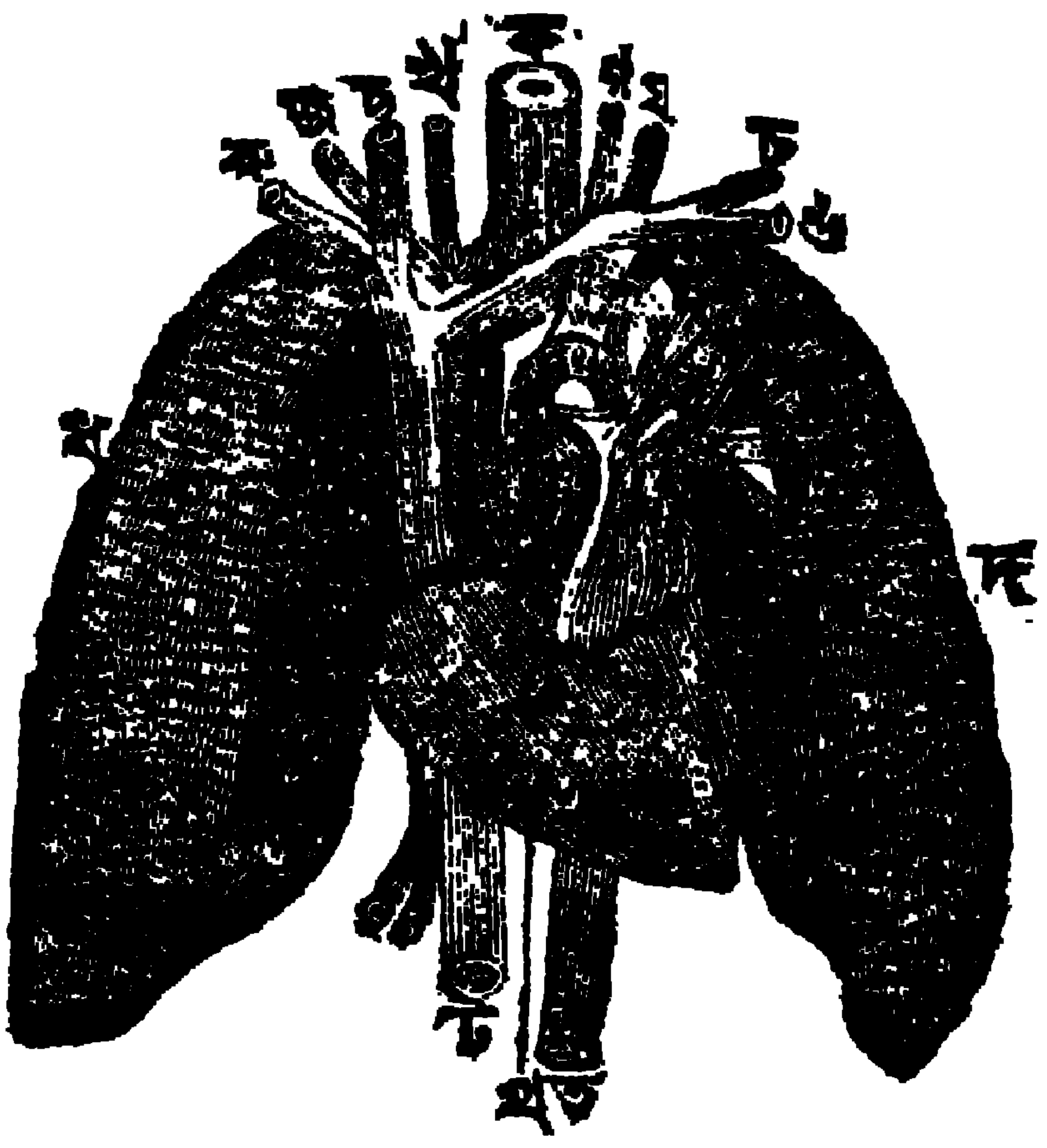

ধ, হৃদয়। ১, ২, দক্ষিণ ও বাম গ্রাহক-কোষ্ঠ। ৩, ৪, দক্ষিণ ও বাম ক্ষেপক-কোষ্ঠ। দ, ধ, বাম ও দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্‌। ৫, ত, বৃহৎ মূল-ধমনী। ট, বৃহৎ নিম্ন-শিরা। ঝ, ঙ, বাহুদ্বয়ের শিরা। চ, জ, বাহুদ্বয়ের ধমনী। ছ, য, মস্তকের শিরা। খ, গ, মস্তকের ধমনী। ক, শ্বাসনালী

রক্তবাহিনী নাড়ী। ইহা দুই প্রকার, ধমনী ও শিরা।

ধমনী। যে সকল নাড়ী হৃদয়-হইতে পরিষ্কৃত রক্ত বহন করে, তাহাদিগের নাম ধমনী (Arteries)।

শিরা। যে সকল নাড়ীদ্বারা অশুদ্ধ ক্লেদপূর্ণ রক্ত শরীর-হইতে হৃদয়ে চালিত হয়, তাহাদিগের নাম শিরা (Veins)।

বৃহৎ-ধমনী (Aorta)। যে বৃহৎ-ধমনীর উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, উহা সকল ধমনীর মূল। এই বৃহৎ-ধমনী হৃদয়ের বাম-ক্ষেপক-কোষ্ঠহইতে উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া, বক্রভাবে বামদিকে নত হইয়া, মেরুদণ্ডের উপরদিয়া উদরে আসিয়া, কটিদেশে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। বৃহৎ-ধমনীর এই শাখা-দ্বয় পুনরায় বহু-সংখ্যক প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, ক্রমে অতি সূক্ষ্ম আকারে পদদ্বয়ের অঙ্গুলীর শেষভাগ-পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। বৃহৎ-ধমনীর বক্র মূলভাগ-হইতে কতকগুলি শাখা ঊর্দ্ধে গমন করিয়া মস্তক, গলা ও হস্তদ্বয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। মেরুদণ্ডো-পরিস্থিত মধ্যভাগহইতে কতকগুলি শাখা বহির্গত হইয়া যকৃৎ, পাকস্থলী, প্লীহা, মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্র-সমূহে প্রবেশ করিয়াছে।

কৈশিকা। ধমনীর প্রত্যেক প্রশাখা যে অতি সূক্ষ্ম শিরায় শেষ হইয়াছে, তাহার নাম কৈশিকা (Capillaries)। এই সকল কৈশিকা এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যব্যতিরেকে দৃষ্টি-গোচর হয় না। কৈশিকাদ্বারা রক্তের পুষ্টিকর ভাগ শোষিত হইলে, উহার অবশিষ্ট পরিত্যক্ত অংশ শিরায় প্রবেশ করে।

শিরা-সকল প্রথমে এই কৈশিকাহইতে কৈশিকার ন্যায়ই অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখায় সমুৎপন্ন হইয়া, ক্রমে স্থূল আকারে হৃদয়ের

দিকে গমন করিয়াছে। শিরার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখা অবশেষে দুইটী প্রধান শিরায় মিলিত হইয়াছে।

যে প্রধান শিরাটী মস্তক, হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থলহইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার নাম উচ্চস্থূল-শিরা (Superior Vena Cava)।

যে প্রধান শিরাটী উদর পাদাদি নিম্ন-প্রদেশ-হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের দক্ষিণ-গ্রাহক-কোষ্ঠে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার নাম নিম্নস্থূল-শিরা (Inferior Vena Cava.)।

রক্ত। যে পুষ্টিকর রস হৃদয়হইতে ধমনী ও শিরাদ্বারা সর্ব্বশরীরে চালিত হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে, তাহার নাম রক্ত। ইহা লোহিতবর্ণ, তরল এবং জল অপেক্ষা ভারি। জলের ভারিত্ব ১০০০ গুণ হইলে রক্তের ভারিত্ব ১০৫৫ গুণ। ইহা পুষ্টিকর নানা উপাদানে নির্ম্মিত:—

১০০০ ভাগ রক্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ভাগ।

জল	৭৮৪.
লোহিতবর্ণ পদার্থ (Red Corpuscles)	১৩০.
আল্‌বিউমেন্ (Albumen)	৭০.
ফাইব্রিন্ (Fibrin)	২.২
তৈলবৎ পদার্থ ইত্যাদি (Fatty matters)	৭.৭৭
খনিজ পদার্থ (Saline matters)	৬.০৩
	১০০০.

রক্তের সহিত অম্লজান (Oxygen), অঙ্গারক (Carbonic Acid) ও যবক্ষারজান (Nitrogen) বাষ্প মিশ্রিত আছে।

এই তিন বাষ্পের মধ্যে অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ অম্লজান-অপেক্ষা অধিক এবং যবক্ষারজান বাষ্পের ভাগ অতি সামান্য।

রক্ত শরীরহইতে নির্গত হইয়া বায়ুর সহিত স্পৃষ্ট হইলেই উহার ফাইব্রিণের গুণে জমিয়া যায়।

ধমনী ও শিরার রক্তে, বর্ণ ও উপাদান উভয়েরই বিশেষ প্রভেদ আছে। ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ, শিরার রক্ত লোহিত কিন্তু ঈষৎ নীল এবং কাল বর্ণের সহিত মিশ্রিত। ধমনীর রক্তে শিরাস্থ রক্ত-অপেক্ষা অধিকতর ফাইব্রিন্ আছে এবং আল্‌বিউমেন্ ও তৈলবৎ পদার্থের ভাগ কম আছে। এই নিমিত্ত ধমনীর রক্ত অপেক্ষাকৃত শীঘ্র জমিয়া যায়। ধমনীর রক্ত পুষ্টিকর এবং শিরাস্থ রক্ত-অপেক্ষা ইহাতে অম্লজান বাষ্পের ভাগ অধিকতর এবং অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ অতি সামান্য পরিমাণে আছে। শিরার রক্ত অশুদ্ধ এবং উহাতে অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ ধমনীর রক্ত-অপেক্ষা প্রায় ৫০ গুণ অধিক আছে।

শিরা ও ধমনী প্রায় পাশাপাশি হইয়া শরীরের সকল স্থানে ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু উভয়ের স্রোতঃ ঠিক বিপরীতবাহী। ধমনীর রক্ত হৃদয় হইতে অন্য দিকে গমন করিয়া থাকে এবং শিরার রক্ত অন্য দিক্‌হইতে হৃদয়ের দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। হৃদয় সূক্ষ্ম মাংসপেশীনির্ম্মিত, এই জন্য উহা সঙ্কীর্ণ ও বিস্তীর্ণ হয়। দক্ষিণগ্রাহক-কোষ্ঠ শরীর হইতে এবং বাম-গ্রাহক-কোষ্ঠ ফুস্‌ফুস্-হইতে রক্ত-গ্রহণ-সময়ে বিস্তীর্ণ হয়। ইহারা রক্তে পূর্ণ হইলে পরে সঙ্কীর্ণ হইয়া ঐ রক্ত ক্ষেপক-কোষ্ঠে ত্যাগ করে। আবার ক্ষেপক-কোষ্ঠদ্বয় প্রথমে রক্তে পূর্ণ হইয়া বিস্তীর্ণ হয়, পশ্চাৎ

সঙ্কীর্ণ হইয়া, দক্ষিণ-ক্ষেপক-কোষ্ঠ ফুস্‌ফুস্‌-শিরাতে এবং বাম-ক্ষেপক-কোষ্ঠ বৃহৎ-ধমনীতে রক্ত ত্যাগ করে। এইরূপ ক্ষেপক-কোষ্ঠদ্বয়ের পুনঃ সঙ্কোচন ও বিসারণ-দ্বারা হৃদয় সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে এবং রক্তের স্রোতঃ তরঙ্গের ন্যায় ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হয়। বক্ষঃস্থলের বাম ভাগের এক স্থানে যাহা ধুক্‌ধুক্‌ করে, তাহা এই হৃদয়ের আঘাতমাত্র।

নাড়ী। ধমনীস্পর্শ-দ্বারা অন্তর্ব্বাহিত শোণিতস্রোতের যে তরঙ্গ-আঘাত আমরা বোধ করি, সাধারণতঃ তাহারই নাম নাড়ী। চিকিৎসকেরা সুবিধাবশতঃ হস্তস্থিত ধমনীর নাড়ী স্পর্শ করিয়া রোগ নির্ণয় করেন। রক্ত-সঞ্চালনের বিশেষ দ্রুততা হইলেই হৃদয়েরও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। শ্রম, রাগ, বয়স, রোগাদি নানা-অবস্থা-ভেদই এই চাঞ্চল্যের কারণ। শিশুদিগের নাড়ী অতিশয় বেগবতী; এক হইতে তিন বৎসর বয়ঃক্রম-পর্য্যন্ত ইহা-দের নাড়ীর এক মিনিটে প্রায় ১৪০ হইতে ৯০ বার আঘাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত নাড়ীর এই বেগ ক্রমে খর্ব্ব হইয়া আইসে। আমাদিগের পূর্ণ-যৌবনাবস্থাতে নাড়ীর আঘাত এক মিনিটে ৮০ হইতে ৭০ বার হইয়া থাকে; এবং বৃদ্ধাবস্থায় আরও হ্রস্ব হইয়া ৭০ হইতে ৬০ বার-পর্য্যন্ত উহার আঘাত হয়। স্ত্রীলোকের নাড়ী পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগামী; পুরুষের নাড়ীর যদি এক মিনিটে ৭০ বার আঘাত হয়, তবে সমবয়স্কা স্ত্রীলোকের ৮০ বার হইবে। উপবেশন বা শয়ন-অপেক্ষা দণ্ডায়মান অবস্থায় নাড়ীর বেগ অধিকতর হয়। ডাক্তারেরা রোগনির্ণয়কালে ঘড়ী দেখিয়া নাড়ীর এই বেগ নির্ণয় করেন।

৩। নিঃশ্বাস।—নিঃশ্বাস শরীরের একটি অত্যাবশ্যকীয় পোষণকার্য্য।

ফুস্‌ফুস্‌। নিঃশ্বাসের প্রধান যন্ত্রের নাম ফুস্‌ফুস্‌। ইহা বক্ষোগহ্বর-মধ্যে হৃদয়ের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত আছে। ফুস্‌ফুস্‌ দুইটি; একটি দক্ষিণ ও অপরটি বাম ফুস্‌ফুস্‌। দক্ষিণটি বামহইতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

শ্বাসনালী। মুখের নিম্নভাগ-হইতে যে একটী নালী গলার মধ্যদিয়া বক্ষঃস্থলে গমন করিয়া উভয় ফুস্‌ফুসের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম শ্বাসনালী। ইহা কণ্ঠে উপস্থিত হইয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটী শাখা দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্‌ ও অপর শাখাটী বাম ফুস্‌ফুসে উপনীত হইয়াছে। এই দুইটী শাখা দুইটি ফুস্‌ফুসে সমাগত হইয়া, বহুসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখায় পুন-র্বিভক্ত হইয়া ফুস্‌ফুসের সর্ব্বস্থানে বিস্তৃত আছে। শ্বাস-নালীর এই সকল অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখার অগ্রভাগে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু-কোষ-সংযোগে ফুসফুস্‌ গঠিত।

নিঃশ্বাস-দ্বারা বায়ু শ্বাসনালীর ভিতর দিয়া উভয় ফুস্‌ফুসে যাইয়া বায়ু-কোষ-সকল পূর্ণ করে। বায়ু-কোষের মধ্যে ও বাহিরে অসংখ্য কৈশিকা ব্যাপ্ত আছে। এই সকল কৈশিকার গাত্র ভেদ করিয়া নিঃশ্বাস-বায়ুর অম্লজান-ভাগ কৈশিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং রক্তস্থ দূষিত পদার্থ-সকল কৈশিকার গাত্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া প্রশ্বাস-বায়ুর দ্বারা শরীরহইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায়। অম্লজান-বাষ্পের সংযোগে রক্ত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ হয়। অশুদ্ধ রক্তের

সহিত যে অঙ্গারকবাষ্প সংযুক্ত থাকে, তাহা এইরূপে প্রশ্বাস-দ্বারা নির্গত হইয়া যায়। একজন সবল পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রতি-নিঃশ্বাসে প্রায় ৩০ হইতে ৩৫ ঘন ইঞ্চ (Cubic Inch) বায়ু ফুস্‌ফুস্‌মধ্যে গ্রহণ করে এবং ২৪ ঘণ্টায় সুস্থির অবস্থায় প্রায় ৬৮৬০০০ ঘনইঞ্চ বায়ু ফুস্‌ফুস্‌মধ্যে প্রবেশ ও উহাহইতে বহির্গমন করে। সুস্থ অবস্থায় এক জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নিঃশ্বাসকার্য্য এক মিনিটে প্রায় ১৪ হইতে ১৮ বার হয়। শৈশব ও বাল্যাবস্থায় ইহা অপেক্ষাকৃত অধিকবার হইয়া থাকে এবং পীড়া বা সুস্থাবস্থায় অথবা পরিশ্রমকালে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে। নিঃশ্বাস-কার্য্য বক্ষঃস্থ মাংসপেশীর সঙ্কোচন শক্তির দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। শ্বাসদ্বারা বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিলে, বক্ষঃস্থ পঞ্জরসকল স্ফীত হয় এবং প্রশ্বাসকালীন বায়ু নির্গত হইলে, ঐ সকল পঞ্জর নত হয়।

শরীরের দূষিত পদার্থ যে কেবল ফুস্‌ফুস্‌-দ্বারাই প্রশ্বাশিত বায়ুর সহিত বিনির্গত হয় এমত নহে, মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ইত্যাদির দ্বারাও বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। পাকযন্ত্র, প্লীহা, ক্লোম এবং অন্ত্র-হইতে অশুদ্ধ রক্ত একবারে হৃদয়ে না যাইয়া, ঐ সকল যন্ত্রের শিরার সহিত মিলিত একটী স্থূলশিরা-(Portal Vein) দ্বারা যকৃতে প্রবেশ করে। যকৃৎদ্বারা এই রক্ত-হইতে পিত্ত উৎপন্ন হইয়া পাককার্য্যে ব্যবহৃত হয়। যকৃতের কোনরূপ বিকৃত-অবস্থা হইলে, এই পিত্ত ও অন্যান্য দূষিত ভাগ রক্ত-হইতে পৃথক্ না হইয়া রক্তেই থাকিয়া যায়। ঐ পিত্তবিমিশ্র রক্ত সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইলে, গাত্র হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে।

ফুস্‌ফুসের কোন রূপ বিকৃত-অবস্থা হইলেই, কাশরোগ উপস্থিত হয়। কাশজনিত কফশ্লেষ্মাদি এই ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরহইতেই সঞ্জাত হইতে থাকে।

৪ রক্ত-মন্থন।—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের দ্বারা রক্তের নানা প্রকার ব্যবহার্য্য বা পরিত্যক্ত ভাগকে স্বতন্ত্র করার নাম রক্ত-মন্থন। যথা,—যকৃৎ রক্তকে মন্থন করিয়া উহার পিত্তভাগ ও শর্করা বাহির করিয়া লয় এবং আরও নানাপ্রকারে রক্তকে বিশুদ্ধ করে। প্লীহা নামে যে আর একটি যন্ত্র উদরের বাম পার্শ্বে আছে, উহা ভুক্তদ্রব্যের যবক্ষারজানবিশিষ্ট বলকারক অংশ গ্রহণ করিয়া রক্তে প্রত্যর্পণ করে। লালা, ক্লোম প্রভৃতি সকল যন্ত্রই রক্ত মন্থন করিয়া স্বস্ব-রস উৎপন্ন করে। মূত্রাশয় ও চর্ম্ম, মূত্র ও ঘর্ম্মের দ্বারা রক্তের কতকগুলি পরিত্যক্ত অংশ শরীর-হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যে কোন রস আমাদের শরীর-মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাহা রক্ত মন্থন হইয়া প্রস্তুত হয়।

পুনরুৎপত্তি।—সন্তানোৎপত্তি ক্রিয়াটী জীবমাত্রেতেই দৃষ্ট হয়। জীবের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ এবং কতকগুলি পুংলিঙ্গ। এই উভয় স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে সন্তানোৎপত্তি হয়।

তরুণবয়স্ক বালকবালিকাদিগের পক্ষে এ প্রবন্ধটি কঠিন হইবার সম্ভাবনায়, পরিত্যক্ত হইল।

চলন।—এক স্থান-হইতে অন্য স্থানে গমন করিবার নাম চলন। এই ক্রিয়াটী কেবল জীবেরই আছে, উদ্ভিজ্জের নাই। মাংসপেশী ও অস্থি-দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও বিসারণ-শক্তিই এই কার্য্য-সম্পাদনের মূলীভূত কারণ। হস্ত ও পদ সঞ্চালনের নিমিত্ত দুই প্রকার মাংসপেশী হস্ত ও পদে সংলগ্ন আছে। একদিকের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইলে, অপরদিকের মাংসপেশী শিথিল হইয়া থাকে। পদের পশ্চাতের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইলে, পদ গুটাইয়া যায় ও সম্মুখের মাংসপেশী শিথিল হয়, এবং পরক্ষণেই সম্মুখের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়া পদ সরল হয় ও পশ্চাতের মাংসপেশী শিথিল হয়। এইরূপ পুনঃ সংস্কোচন ও বিসারণদ্বারা চলন-কার্য্য সম্পাদিত হয়।

চেতন।—মস্তকের মধ্যে মস্তিষ্ক নামে যে পদার্থ আছে, তাহাহইতেই মনের সকল প্রকার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুরজ্জু এবং উহার শাখা-স্নায়ুসকল এই চেতনের যন্ত্র। এই সকল শাখা-স্নায়ু শরীরের ইন্দ্রিয় সকলের সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ রাখিয়া, ইন্দ্রিয়দিগের বোধ জন্মাইয়া দেয়।

ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার; দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ।

দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষুঃ আমাদিগের দেহের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য যন্ত্র। ইহার ন্যায় অপূর্ব্ব দৃষ্টি-যন্ত্র আমাদিগের বুদ্ধিতে কল্পনা করাও অসাধ্য। পণ্ডিতেরা চক্ষুকে আদর্শ করিয়া, দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণাদি দৃষ্টিযন্ত্রসকল নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মস্তিষ্ক-হইতে দর্শন-স্নায়ু উত্থিত হয় এবং দ্বিভাগ হইয়া চক্ষুর্দ্বয়ে প্রবেশ করে। দর্শন-স্নায়ু চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত আছে। কোন বস্তুর ছায়া চক্ষের তারার মধ্য-দিয়া এই বিস্তৃত স্নায়ুতে (Retina) পতিত হইলেই, আমাদিগের দর্শনজ্ঞান

জন্মে, তাহা হইলেই আমরা সেই বস্তুকে দেখিতে পাই।

শ্রবণেন্দ্রিয়। কর্ণ এই ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র। কর্ণ তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। বহিরংশ, মধ্যাংশ এবং অন্তরাংশ। কর্ণের ছিদ্র শম্বূকের ন্যায় ঘূর্ণিত। শব্দের দ্বারা বায়ু আন্দোলিত হইয়া, কর্ণের বহির্দ্বারে প্রবেশ করিয়া, অতি বেগে মধ্যদেশে গমন করে; এবং তথায় একখানি অতি পাতলা চর্ম্মে (Tympanum) অভিঘাত প্রদান করিয়া, ক্রমে অন্তরাংশে সমাগত হয়। এই শ্রবণবিবরের অভ্যন্তরীণ স্থানে মস্তিষ্ক-হইতে নির্গত শব্দবাহক স্নায়ুর সহিত এই শব্দ-সমান্দোলিত বায়ুর সংযোগে শব্দ-জ্ঞান জন্মে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ইহার যন্ত্র নাসিকা। নাসিকারন্ধ্রের ত্বক্ অতি কোমল এবং রসযুক্ত। মস্তিষ্ক-হইতে ঘ্রাণস্নায়ু উৎপন্ন হইয়া এই ত্বকে বিস্তৃত আছে। গন্ধদ্রব্য হইতে অতি সূক্ষ্ম অলক্ষ্য পরমাণু-সমূহ নির্গত ও বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। এই পরমাণুগুলি ঘ্রাণস্নায়ুর সহিত সংলগ্ন হইলেই, ঘ্রাণবোধের উৎপত্তি হয়।

রসনেন্দ্রিয় বা আস্বাদন। ইহার যন্ত্র জিহ্বা। খাদ্যদ্রব্যের স্বাদবোধশক্তি মুখের অন্যান্য অংশেও কিয়ৎ পরিমাণে আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু জিহ্বাতেই বিশিষ্টরূপে আছে। জিহ্বার উপরিভাগে কতকগুলি সূক্ষ্ম-লোম-সদৃশ ঈষৎ-উচ্চ পদার্থ (Papilla) দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের মধ্যে স্বাদস্নায়ুর শাখা আসিয়া জিহ্বায় বিস্তৃত রহিয়াছে, এইজন্যই তাহারা আস্বাদনবোধ জন্মাইয়া দেয়।

স্পর্শেন্দ্রিয়। শরীরের আচ্ছাদন যে চর্ম্ম বা ত্বক্, তাহার সকল স্থানেই স্নায়ুরজ্জুর শাখা-প্রশাখা-স্নায়ু অতি সূক্ষ্মরূপে বিস্তৃত আছে, এবং ইহারাই স্পর্শবোধ জন্মাইয়া দেয়। ত্বক্ কঠিন বা স্থূল হইলে, স্পর্শ-বোধ কম হয়, গুল্‌ফদেশপ্রভৃতিই ইহার উদাহরণ। স্পর্শবোধ সর্ব্বাঙ্গেই হয়, কিন্তু অঙ্গুলির অগ্রভাগে বিশেষরূপে বোধ হয়।

বাক্য।—নানা স্বরে নানা প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব অবিকল ব্যক্ত করার নাম বাক্য। ইহা আমাদিগের শরীরের একটী আশ্চর্য্য ক্রিয়া। ইহা কেবল মনুষ্যেরই আছে, আর অন্য কোন প্রাণির নাই। ইতরপ্রাণিরা বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারা মনের ভাব কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না।

বাগ্‌যন্ত্র। শ্বাসনালীর সর্ব্বোপরি অংশেরই নাম বাগ্‌যন্ত্র। কিন্তু ইহা স্বতন্ত্রগঠনবিশিষ্ট। ইহা তিন প্রকার উপাস্থি-দ্বারা এবং কতকগুলি রজ্জুর ন্যায় মাংসপেশীদ্বারা গঠিত। উপাস্থিগুলি কেহ ফলকাকৃতি, কেহ ধুস্তূর পুষ্পাকৃতি এবং কেহ অঙ্গুরীয়াকৃতি। ইহার মধ্যে ফলকাকৃতি উপাস্থিই বৃহৎ, এবং গলদেশে উহার উচ্চভাগ দৃষ্ট হয়। ইহাকেই চলিত কথায় টুঁটী বলে। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই উচ্চভাগের বৃদ্ধি হয়; তদনুসারে স্বরেরও তারতম্য হইয়া থাকে। বাল্যকালে এই উচ্চভাগ অল্প প্রকাশিত থাকে এবং, স্বরও কোমল থাকে। স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই বয়ঃপ্রাপ্তির পর এই উচ্চভাগ ক্রমশঃ অধিক প্রকাশিত হয়; তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরও কর্কশ হইয়া পড়ে। ধুস্তূর-

পুষ্পাকৃতি উপাস্থিদ্বয়ের সহিত সূক্ষ্ম মাংসপেশী অর্থাৎ স্বররজ্জু-সকল সংযোজিত আছে; ঐ সকল রজ্জু শিথিল বা আকৃষ্ট হইলে, স্বরের তারতম্য হয়।

উচ্চারণস্থান। এই সকল স্বর-রজ্জুর অবস্থানুযায়ী স্বরের উচ্চতা বা নীচতার তারতম্য হয় বটে, কিন্তু শব্দ-বিশেষের উচ্চারণের নিমিত্ত ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা, তালু প্রভৃতিরও সাহায্য আবশ্যক করে। স্বরবর্ণ প্রায় কণ্ঠস্থিত বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত হয়, কিন্তু হলবর্ণের উচ্চারণ তদ্রূপ নহে; ইহারা ওষ্ঠ, তালু, দন্ত ও জিহ্বার সাহায্য-ভিন্ন উচ্চারিত হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

খাদ্য।

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নিঃশ্বাস, জলপান ও আহার, এই তিনটী আমাদিগের জীবন-রক্ষার নিতান্ত আবশ্যক ক্রিয়া। তন্মধ্যে আহার কার্য্যটি খাদ্যদ্রব্য-দ্বারা সম্পন্ন হয়।

শারীরিক ক্ষয়। শরীরের সমস্ত পদার্থ সতত ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনায় এবং যন্ত্র-সমূহের স্ব স্ব কার্য্য সাধনে মাংস, স্নায়ু এবং অন্যান্য দৃঢ় ও জলীয় পদার্থের সততই ক্ষয় হইয়া থাকে। যে কোন সামান্য কর্ম্ম আমরা করি, তাহাতেই আমাদিগের শরীর কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক পা চলিলে, বা একটী কথা কহিলেও, আমাদের শরীরের কিছু না কিছু ক্ষয় হয়। কেবল যে ইচ্ছানুগত অঙ্গচালনা-প্রভৃতি

ক্রিয়া-দ্বারাই আমাদের শরীরের ক্ষয় হয়, এমত নহে, শরীরের স্বাভাবিক কতকগুলি ক্রিয়া আছে, তাহাদের দ্বারাও শরীরের সূক্ষ্ম পদার্থ সকল ক্রমে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। পরিপাক, রক্তসঞ্চালন, নিঃশ্বাস, রক্তমন্থন ইত্যাদি শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া-সকল আমাদিগের ইচ্ছাধীন নহে, অজ্ঞাত ভাবেই সর্ব্বদা সাধিত হইয়া থাকে, অপিচ নিদ্রাবস্থাতেও ক্ষান্ত নহে। যত আমরা চিন্তা করি, ততই আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষয় হয়। যদ্যপি প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যা-ত্যাগান্তে কোন ব্যক্তিকে ওজন করা যায়, এবং তাহার পরে আহারের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত তিন চারি ঘণ্টা পরিমিত পরিশ্রমের পর সেই ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার ওজন করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে এই উভয়বিধ গুরুত্বের অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। প্রথম ওজন-অপেক্ষা শেষ ওজন অধিকতর পরিমাণে কম হইবে। তাহার কারণ অঙ্গচালনা, চিন্তা প্রভৃতি নানা শারীরিক ক্রিয়া-দ্বারা ঐ তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে শরীরের অনেক ক্ষয় হইয়াছে।

ক্ষয়ভাগ নানা উপায়ে শরীরহইতে বহির্গত হয়;—কতকগুলি ফুস্‌ফুস্‌দ্বারা প্রশ্বাসিত বায়ুর সহিত নির্গত হয়, কতক মূত্রাশয়-দ্বারা মূত্রের সহিত এবং কতক চর্ম্মের দ্বারা ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্য্যেও শরীরের ক্ষয়ভাগ নির্গত হইয়া থাকে। এইরূপে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজন সবল ব্যক্তির শরীর হইতে ৩ বা ৩৷৷৹ সের-পর্য্যন্ত পদার্থ নির্গত হয়। তবে এইরূপ সর্ব্বদাক্ষয়-দ্বারা আমাদের শরীর নিশ্চয়ই শীঘ্র শীর্ণ হইয়া যাইত, যদ্যপি ঐ ক্ষতিপূরণের কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট না থাকিত।

নিত্য নূতন দ্রব্য শরীর-মধ্যে গ্রহণ না করিলে, এই ক্ষতিপূরণের আর অন্য উপায় নাই। খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্য-সকল শরীর-মধ্যে গ্রহণ করিবার কৌশল আছে বলিয়াই ঐ সকল দ্রব্য পাকস্থলীতে গৃহীত হইয়া, শরীরের পুষ্টি সাধন করে। বায়ুর জীবনীভাগ যে অম্লজান-বাষ্প আমরা নিঃশ্বাস-দ্বারা শরীর মধ্যে গ্রহণ করি, তাহাও উক্ত ক্ষতিপূরণের একটি উপায় বলিতে হইবে। যে পরিমাণে শরীর ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন নূতন আহারীয় দ্রব্য ব্যক্তি-মাত্রেরই শরীর-মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ শিশুগণের শরীর নিত্য বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাদিগের শরীরের ক্ষয়-ভাগ-অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে তাহাদিগকে আহার গ্রহণ করিতে দেওয়া বিধেয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আমাদের আহার্য্য বা পানীয় ভাত, রুটী, দাল, তরকারী, ফলমূল, বা জল ইত্যাদি জীবনশূন্য পদার্থনিকর কিরূপে জীবন-প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের শরীরের মাংস, অস্থি, কেশ, চর্ম্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে পরিণত হয়? ঈশ্বরের এই আশ্চর্য্য জীবন-প্রণালী আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। এইরূপ কত শত আশ্চর্য্য ব্যাপার তাঁহার সৃষ্টিতে আমাদিগের নয়নগোচর হয়, যাহার ভাব আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি না, কেবল আশ্চর্য্য হইয়া অবলোকন করি, এবং তাঁহার অসীম শক্তির প্রশংসা করিয়া মনের উদ্বেগ নিবারণ করি।

শারীরিক তাপ। জীবন রক্ষার আর একটি অত্যাবশ্যক উপায়। এই তাপ শরীরের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান রাখিবার নিমিত্ত অগ্নির আবশ্যকতা করে, অতএব সর্ব্বক্ষণ অগ্নি রাখিতে

হইলেই কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। এই জীবনাগ্নির কাষ্ঠ আমরা খাদ্যদ্রব্য-হইতেই সংগ্রহ করি। ভুক্তদ্রব্যের শ্বেতসার, তৈলময় ও শর্করা অংশ রাসায়নিক-কার্য্য-বিশেষ-দ্বারা নানা অবস্থা-প্রাপ্ত হইয়া, দেহের উষ্ণতা রক্ষা করে। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য-দ্রব্য আমাদের শারীরিক পুষ্টতা ও জীবনরক্ষিতার একটি প্রধান উপায়।

খাদ্য-বিভাগ।—খাদ্যদ্রব্য প্রধান দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে; সজীব ও নির্জীব পদার্থ।

সজীব-খাদ্যদ্রব্য (Organic)। সজীব উদ্ভিজ্জ ও প্রাণি-সমূহ-হইতে যে খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হয়, তাহার নাম সজীব-খাদ্যদ্রব্য। যথা—শস্য, ফল, মূল, ডিম্ব, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি।

নির্জীব-খাদ্যদ্রব্য (Inorganic)। খনিজ-হইতে যে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম নির্জীব-খাদ্যদ্রব্য। ইহারা প্রায় সজীব দ্রব্যের সহিত স্বতঃই সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—লবণ, চূণ, জল ইত্যাদি।

সজীব-খাদ্যদ্রব্য দুই প্রকার, (১) যবক্ষারজান-বিশিষ্ট (Nitrogenous) ও (২)যবক্ষারজান-বিহীন (Non-Nitrogenous)। (১) মাংস, ডিম্ব, গোম, চাল, দাল প্রভৃতি শস্যাদি যবক্ষারজান-বিশিষ্ট এবং (২) সরাপ, বসা, তৈল, শর্করা, শ্বেতসার, গোঁদ ইত্যাদি দ্রব্যসকল যবক্ষারজান-বিহীন।

যবক্ষারজান-বিহীন সজীব পদার্থ আবার দুই অংশে বিভক্ত;—(১) বসা ইত্যাদি তৈলময় পদার্থ (Hydro-carbons) এবং (২) শর্করা ইত্যাদি (Carbo-Hydrates)।

(১) বসা, তৈল ইত্যাদি দ্রব্যে অঙ্গার ও উদ্‌জান, সামান্য পরিমিত অম্লজানের সহিত মিশ্রিত আছে।

(২) শর্করা, শ্বেতসার, গোঁদ ইত্যাদি দ্রব্যে অঙ্গার অধিক পরিমিত অম্লজান ও উদ্‌জানের সহিত মিশ্রিত আছে।

এইরূপে খাদ্য দ্রব্য প্রধান চারি অংশে বিভক্ত হইল ;— (১) যবক্ষারজান-বিশিষ্ট বলকারক দ্রব্য (Albumenous), (২) তৈলময় (Oleaginous), (৩) শর্করাসংযুক্ত (Saccharine) এবং খনিজ পদার্থ (Minerals)।

এক্ষণে ইহাদের প্রত্যেকের গুণ, এবং কে কি নিয়মে আমাদের শরীরের কার্য্য সাধন করে, তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

(১) যবক্ষারজান-বিশিষ্ট বলকারক (Albumenous) পদার্থে যবক্ষারজান (Nitrogen) অধিক পরিমাণে আছে। ইহার দ্বারা শরীরের মাংস, মেদ, স্নায়ু প্রভৃতি পদার্থ-সকল নির্ম্মিত হয় এবং উহাদের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ-সকলের পূরণ হইয়া থাকে। এই খাদ্য-দ্রব্যের উপযুক্ত পরিমাণের অল্পতা হইলে, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, পাক ইত্যাদি প্রধান ক্রিয়া-সকল নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হয় না। এই জন্যই শারীরিক বলের এবং মস্তিষ্কের হ্রাস হইয়া পড়ে ; তাহাতে শরীর ক্রমে দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হয়। আবার অধিক পরিমাণে এই সকল দ্রব্য আহার করিয়া, তাদৃশ পরিশ্রম না করিলে, অতিরিক্ত পুষ্টিজনক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

(২) অঙ্গার ও উদ্‌জান-বিশিষ্ট তৈলময় পদার্থ (Hydro-carbons or Oleaginous substances)।—ঘৃত, বসা বা চর্ব্বি,

নানাবিধ উদ্ভিজ্জ-তৈল (যথা নারিকেল-তৈল, সরিষা-তৈল, ভেরাণ্ডাতৈল ইত্যাদি) এবং প্রাণিজ তৈল (যথা, কড্ মৎস্যের তৈল ইত্যাদি) সকলই এই শ্রেণীভুক্ত। এই সকল পদার্থ প্রধানতঃ তাপ-উদ্ভাবনে ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ মেদ, মাংস এবং মস্তিষ্কের তৈলময় অংশরূপে পরিণত হয়; কিন্তু তাহার কিয়দংশ স্বতন্ত্ররূপে শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া যায়। এই সকল দ্রব্য শরীরের প্রয়োজনাধিক আহার করিলে, কতক অংশ শরীরের কার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং অতিরিক্ত ভাগ মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত, মাখন ও সরিষার তৈল আমরা অধিক পরিমাণে খাদ্যের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি। বসা আমরা ব্যবহার করি না, কিন্তু ইউরোপীয় এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে উহা একটি বিশেষ আহারীয় দ্রব্য।

(৩) অঙ্গার, উদজান ও অম্লজান-বিশিষ্ট পদার্থ (Carbo-Hydrates or Saccharine substances)। নানাবিধ শ্বেতসার, শর্করা, গোঁদ ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। যদিও এই সকল দ্রব্য শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু প্রায় সকল জাতির মধ্যেই ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অঙ্গার ও উদজান-বিশিষ্ট খাদ্য-শ্রেণীস্থ পদার্থের ন্যায় ইহারাও শরীর-মধ্যে তাপ উদ্ভাবন করে। অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ইহারা বসায় পরিণত হয়। এই বসা অধিক পরিমাণে শরীর-মধ্যে সঞ্চিত হইলে, আমাদিগকে স্থূলাকার করিয়া ফেলে। শর্করা নানা প্রকার:-খাজুরের আকের গুড়, চিনি ও মিছরি, তালের মিছরি, মধু ইত্যাদি ইহা অধিক পরিমাণে আহার

করিলে, অম্ল এবং বায়ু উৎপন্ন হইয়া পাক-কার্য্যের বিশেষ অনিষ্ট করে। সাগু, আরোরুট, টাপিওকা, পানফল, গোল আলু, চাউল, গোম ইত্যাদি দ্রব্যে শ্বেতসার অধিক পরি- মাণে আছে, এই নিমিত্ত ইহারা বহুমূত্র-রোগে বিশেষ নিষিদ্ধ।

(৪) নির্জীব খনিজ-পদার্থ (Minerals)। লবণ, চুণ, জল ইত্যাদি দ্রব্য এই বিভাগভুক্ত। ইহারা যবক্ষারজান-বিশিষ্ট খাদ্য-শ্রেণীর এবং অঙ্গার ও উদজানবিশিষ্ট খাদ্য শ্রেণীর দ্রব্যের ন্যায় শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের জীবন-ধারণের নিমিত্ত জল একটি প্রধান পদার্থ। উহা অধিক পরিমাণে আমাদের শরীরের সকল পদার্থেই বিদ্যমান আছে। লবণ আমাদিগের খাদ্যের একটি বিশেষ উপকরণ। চুণ প্রভৃতি কঠিন খনিজ পদার্থদ্বারা অস্থি নির্ম্মাণ হয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দুগ্ধকে আদর্শ করিয়া খাদ্যদ্রব্য এই-রূপ প্রধান চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। দুগ্ধের উপাদান-মধ্যে এই চারি প্রকার পদার্থই দৃষ্ট হয়; যথা, যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ উহার ক্ষীর বা পনির (Casein), তৈলময় পদার্থ উহার সর বা মাখন (Butter), শর্করা উহার মিষ্ট ভাগ এবং জল, লবণ ইত্যাদি উহার খনিজ পদার্থ।

যে চারি শ্রেণীর খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ করা হইল, ইহার কেবল কোন একটি শ্রেণীর দ্রব্য আহার করিয়া থাকিলে শরী-রের পুষ্টি সাধন হয় না, সকল শ্রেণীর দ্রব্য যথা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া আহার না করিলে শরীর শীর্ণ হইয়া যায় এবং জীবন সংশয় হয়।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের খাদ্যের নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা যে দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এই চারি শ্রেণীর দ্রব্য যথা ভাগে মিলিত আছে, এই নিমিত্ত কেবল দুগ্ধ আহার করিয়াই শিশুগণ পুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয়। দুগ্ধে এই কয়েক প্রকার পদার্থের প্রত্যেক ভাগ এমন পরিমাণে মিশ্রিত আছে যে তাহা শিশুশরীরের বিশেষ উপযোগী।

মনুষ্য ও গাভী দুগ্ধের ১০০০ ভাগে কোন্ উপাদান কত পরিমাণে আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

	মনুষ্য-দুগ্ধ	গাভী-দু
জল	৮৯০	৮৫৮
পনির বা ক্ষীর	৩৫	৬৮
মাখন বা সর	২৫	৩৮
শর্করা	৪৮	৩০
লবণ ইত্যাদি	২	৬
	১০০০	১০০০

খাদ্যদ্রব্য প্রধান চারি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে, এক্ষণে যে সকল ভক্ষ্যদ্রব্য আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে সকল সজীব যবক্ষারজান-বিশিষ্ট বলকারক দ্রব্য আমরা ভক্ষণ করি, তাহা কতক উদ্ভিজ্জহইতে এবং কতক প্রাণিহইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ প্রথমে বিবৃত হইতেছে।

১। উদ্‌ভিজ্জ যবক্ষারজান-বিশিষ্ট বলকারক-দ্রব্য।—ইহাতে শরীরের মেদ, মাংস প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ইহা দুই প্রকার—কলায় ও শস্য।

(১) কলায়। যে উদ্ভিজ্জ দ্রব্য শুঁটীর মধ্যে জন্মে, তাহার নাম কলায়। আমাদের দেশে কলায় নানাপ্রকার;—মুগ, মাসকলায়, মসুর, তেওড়া বা খেঁসারি, অরহর, ছোলা বা বুট, শাদাছোলা, মটর, বরবটী, শিম ইত্যাদি।

উদ্‌ভিজ্জ-পনির (Legumen)।—দুগ্ধের মধ্যে যেমন পনির (Casein) উহার বলকারক পদার্থ, তেমন এই সকল কলায়ের মধ্যে যে বলকারক পদার্থ আছে, তাহার নাম উদ্ভিজ্জ-পনির।

কলায়ের সমস্ত উপাদান পদার্থের ১০০ ভাগের মধ্যে এই বলকারক সার পদার্থ ২৫ হইতে ৩০ ভাগ। আধসের /॥০ কলায়েতে যে সার আছে, /৭॥০ সের গোল আলুতে তাহা আছে। কিন্তু মনুষ্যের পাকাশয়ে শস্য বা মাংস যেরূপ সহজে জীর্ণ হয়, কলায় সেরূপ হয় না, এই নিমিত্ত উহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট খাদ্যের মধ্যে গণ্য। এ সকল দ্রব্য রন্ধনদ্বারা সুসিদ্ধ না হইলে, পরিপাকের ব্যাঘাত করে। তাহাতেই অজীর্ণতা দোষ জন্মে। কলায়ের সহিত ঘৃত বা শ্বেতসার কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহার করিলে অধিক উপকারী হয়। সকল দাল-অপেক্ষা মসুর দালে বলকারক সার-পদার্থ অধিকতর পরিমাণে আছে, এই নিমিত্ত বৈদ্যেরা দুর্ব্বল রোগিকে মসুরের ঝোল ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

(২) শস্য। এই দ্রব্য মনুষ্যজাতি-মাত্রের জীবন ধারণের

প্রধান খাদ্য। আমাদের দেশে প্রধান শস্য চাল, গোম, যব, জনার ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ বলকারক পদার্থ (Gluten)। মাংস, ডিম্ব, ইত্যাদি প্রাণিজ দ্রব্যসমূহে, ফাইব্রিন (Fibrin) যেমন বলকারক পদার্থ, শস্যাদি উদ্ভিজ্জ দ্রব্যে গ্লুটেনও সেইরূপ বলকারক পদার্থ।

চাল। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই চাল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমাদের দেশেই ইহার জন্ম। বহুকাল-হইতে ইহা ভারতবর্ষ, চীন এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপসমূহ-বাসিগণের প্রধান খাদ্যদ্রব্য হইয়া আসিতেছে। চালে বলকারক সার-ভাগ (Gluten) অপেক্ষাকৃত কম; ইহার সমস্ত পদার্থের ১০০ ভাগের মধ্যে ৩ হইতে ৭ ভাগ সার পদার্থ। বলকারিত্বে ইহাকে সকল-শস্য-অপেক্ষা নিকৃষ্টতম বলিতে হইবে। এই নিমিত্ত ইহার সহিত মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, দধি, দাল ইত্যাদি অন্য প্রকার বলকারক দ্রব্য ব্যবহৃত না করিলে, শরীরের সম্যক্ পুষ্টি হয় না। ভাতের স্বাদ পানসে, এই নিমিত্ত রুটী-অপেক্ষা ভাত খাইতে অধিক তরকারী বা মিষ্ট সামগ্রীর আবশ্যকতা হয়। চাল কিছু দিন শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে শীঘ্র জীর্ণ হয়, এই নিমিত্ত নূতন চালের ভাত খাইলে, প্রায় পেটের পীড়া হয়। অভাবপক্ষে ছয় মাস পরে নূতন চাল ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকেরা অগ্রহায়ণ মাসে নূতন চাল উঠিতে না উঠিতেই নবান্ন উৎসর্গ করিয়া ফেণে ফেণে নূতন চালের ভাত বিশেষ তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। পুরাতন-অপেক্ষা

নূতন চালের ভাত অধিকতর সুস্বাদু হইতে পারে, কিন্তু পীড়াদায়ক বলিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। এতদ্দেশে দুই প্রকার চাল প্রস্তুত হয়; আতপ ও সিদ্ধ। সিদ্ধ-অপেক্ষা আতপ চাল অধিকতর পুষ্টিকর। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা আতপ-চাল-ভিন্ন সিদ্ধ চাল ব্যবহার করে না।

গোম। সকল শস্য-অপেক্ষা গোম শ্রেষ্ঠ, বল-কারক সার পদার্থ চাল-অপেক্ষা ইহাতে অধিক আছে। ইহার ১০০ ভাগে সার পদার্থ প্রায় ১০ ভাগ। ইহাতে তৈলময় পদার্থের ভাগ অল্প আছে বলিয়া, ইহা রুটী প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিতে হইলে, ঘৃত বা মাখনের সহিত ব্যবহার করা উচিত। গোম-হইতে ময়দা, আটা এবং সুজি প্রস্তুত হয়। আমরা ইহার দ্বারা রুটী, লুচী, ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করিয়া থাকি। পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ লোকে কেবল গোম ব্যবহার করে। এই নিমিত্ত তাহারা অন্নাহারী বাঙ্গালী-অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টকায় এবং বলবান্।

২। প্রাণিজ যবক্ষারজান-বিশিষ্ট বলকারক-দ্রব্য।—পশুপক্ষ্যাদির মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্যের সারভাগ আল্‌বিউমেন্ (Albumen,) ফাইব্রিন্ (Fibrin) এবং পনির (Casein)।

মাংস। ইহাতে যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে। মনুষ্যেরা জাতিভেদে ভিন্ন প্রকার মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে। হিন্দুজাতির মধ্যে কেবল ছাগ ও মৃগ এবং দুই এক প্রকার পক্ষির মাংস ভক্ষণীয়। ইউরোপখণ্ডের লোকেরা

গো, মেষ, শূকর, কুক্কুটজাতিয় ও অন্যান্য পক্ষী এবং কখন কখন অশ্ব মাংসও ব্যবহার করিয়া থাকে। মুসলমানেরা শূকর-ব্যতীত শেষোক্ত সকল মাংসই ব্যবহার করে। পাকা মাংস অপেক্ষা কচি মাংস নরম এবং শীঘ্র জীর্ণ হয়।

মৎস্য। আমাদের দেশে মৎস্য নানাপ্রকার; তন্মধ্যে রোহিতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অধিক তৈলযুক্ত মৎস্য-মাত্রেই গুরুপাক; যথা, ইলিস, তপ্‌সে, ভাঙ্গন, চেতল, পার্‌সে ইত্যাদি। এই সকল মৎস্য অধিক ভক্ষণ করিলে, পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। সমুদ্রের লবণাক্ত মৎস্য-অপেক্ষা পুষ্করিণী-জাত কই, মদ্‌গুর, শিঙ্গী, ছোটপোনা, মৌরলা, বেলে প্রভৃতি মৎস্যসকল লঘু-পাক এবং রোগির পক্ষে উপকারী। চিংড়ীকে আমরা মৎস্যের মধ্যে গণ্য করি এবং সচরাচর চিংড়িমাছ বলিয়া থাকি; কিন্তু উহা বাস্তবিক মৎস্য নহে, কাঁকড়া-শ্রেণীভুক্ত। চিংড়ি মাছের মাথার মধ্যে ঘৃতবৎ বস্তু অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর; কিন্তু উহার শরীরভাগ সুসিদ্ধ না হইলে, শীঘ্র জীর্ণ হয় না।

ডিম্ব। হংস, কুক্কুট প্রভৃতি কয়েকটি পক্ষির ডিম্ব মনুষ্যের ভক্ষ্য। ডিম্বের মধ্যে যে তরল শ্বেত পদার্থ থাকে, উহাকে অণ্ড-লালা বা আল্‌বিউমেন্ (Albumen) বলে, উহা বিলক্ষণ পুষ্টিকর। সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ-অপেক্ষা অর্দ্ধসিদ্ধ বা কাঁচা অণ্ড শীঘ্র জীর্ণ হয়।

দুগ্ধ। সকল খাদ্যের আদর্শস্বরূপ। শিশুগণ কেবল ইহাই পান করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে এবং দিন দিন বলপ্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ সারক এবং এক বা দুই বলক্ জাল দিয়া খাইলে, বিশেষ

উপকারক হয়; অধিক জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিয়া পান করিলে পীড়াদায়ক হইতে পারে। আমাদের দেশে মাংসের ব্যবহার সামান্য আছে বলিয়া দুগ্ধ অপেক্ষাকৃত-অধিক আদরণীয়। আমাদের প্রধান আহারই দুগ্ধ। দুগ্ধহইতে বহুবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়; যথা, ঘৃত, মাখন, সর, চাঁচী, ঘোল, দধি, ছানা, ক্ষীর, পনীর, খমীর, মালাই ইত্যাদি। ইহার মধ্যে ঘৃত সর্ব্বপ্রধান এবং অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঘৃতপক্ক দ্রব্য যেমন সুস্বাদু তেমনই পুষ্টিকর। নবনীতও সুস্বাদু, এবং ঘৃত-অপেক্ষা শীঘ্রতর পরিপাক হয়। ছানা গুরুপাক। ঘোল সহজেই পরিপাক হয়। দধি পুষ্টিকর এবং চিনির সহিত মিশ্রিত হইলে অতি সুস্বাদু হয়। দধিতে অম্লরস আছে বলিয়া উহা অধিক খাইলে পীড়াদায়ক হয়।

দুগ্ধ গুরুপাক গুণবিশিষ্ট এবং অন্ন-অপেক্ষা অধিকতর কালে জীর্ণ হয়। পরিমাণ মত না পান করিলে ইহা ভেদক হইয়া পড়ে; এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা দুইটি গুরুপাক দ্রব্য দুগ্ধ ও মাংস একত্রে খাইতে নিষেধ করেন।

আমিষভোজন। এক্ষণে দেখা যাউক, আমিষ ভোজন করা মনুষ্যের পক্ষে উচিত কি না। আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্য ব্যবহার করে। কেহ কেবল উদ্ভিজ্জভোজী, কেহ আমিষভোজী এবং কেহ মিশ্রভোজী, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ ও আমিষ দুই ব্যবহার করে। মনুষ্যের পক্ষে আমিষ ভোজন নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হউক, অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশে

অধিকাংশ লোক কেবল উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করিয়া শরীরের পুষ্টি-সাধন করে, এবং প্রাণিহত্যা করিয়া আমিষ ভক্ষণ করাকে নিতান্ত নিকৃষ্ট ও অস্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া মনে করে। উদ্ভিজ্জ ভোজিগণ তর্ক করিয়া থাকেন যে, জীবহিংসা করিয়া আমিষ ভক্ষণ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, এবং মাংস মনুষ্য-পাক-যন্ত্রের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। ইহার উত্তরে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, অনেক দেশের মনুষ্যজাতি আমিষ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। দেশ-বিশেষে কোন কোন জাতি উদ্ভিজ্জ অভাবে কেবল আমিষ ভক্ষণ করিয়াই জীবন রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। শীতপ্রধান দেশের যে স্থানে উদ্ভিজ্জ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, সে স্থানের লোকদিগকে উদ্ভিজ্জের অভাবে কেবল মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়। উষ্ণপ্রধান দেশে উদ্ভিজ্জের আতিশয্য আছে বলিয়া, সে স্থানের লোকেরা আহারের নিমিত্ত প্রায় উদ্ভিজ্জের উপর অধিকাংশ নির্ভর করে। আবার সমশীতোষ্ণ দেশে প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জের ভাগ প্রায় সমতুল্য থাকাতে সে স্থানের লোকেরা উভয় প্রকার দ্রব্য-হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। স্তন্য-পায়ী জীবগণের পাকযন্ত্রের কৌশল দেখিয়া আমরা স্থির করিতে পারি যে, কাহারা উদ্ভিজ্জ এবং কাহারা আমিষভোজী। আমিষ ও উদ্ভিজ্জভোজিদিগের দন্তেরও প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মনুষ্যজাতির ন্যায় মিশ্রভোজিদিগের পাকযন্ত্র এবং দন্তের গঠন উদ্ভিজ্জ-ভোজন ও আমিষভোজন এই উভয় প্রকারের মাঝামাঝী। ইহাতে বোধ হয় যে, মনুষ্যজাতির পক্ষে মিশ্রভোজন নিতান্ত অসংগত নহে। ভারতবর্ষে কিম্বা পৃথিবীর যে কোন স্থানে,

সম্পূর্ণ-উদ্ভিজ্জভোজী ব্যক্তি আছে, এমন বোধ হয় না। এদেশে অনেকে আমিষ ভক্ষণ করে না বটে, কিন্তু তাহারা প্রাণী-হইতে উদ্ভূত দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি দ্রব্য-সকল অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব সম্পূর্ণ উদ্ভিজ্জভোজী ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে বিরল বলিয়া বোধ হয়।

সামান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি অপেক্ষা আমিষ ভক্ষণ করিলে পাকস্থলীতে অধিকতর ভার বোধ হয়; কিন্তু ইহার পরিপাক-কার্য্য উদ্ভিজ্জঅপেক্ষা অনেকতর পরিমাণে সুলভ ও অল্পতর সময়-মধ্যে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত উদ্ভিজ্জভোজী জন্তুদিগের পাকযন্ত্র আমিষভোজী জন্তুদিগের পাকযন্ত্র-অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে দীর্ঘ ও জটিল। মাংস, মৎস্য প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্যে যবক্ষারজানবিশিষ্ট বলকারক পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া উহা ভক্ষণে শরীরের মাংসপেশী দৃঢ় ও পুষ্ট হয়, এবং শরীরে বসা অধিক পরিমাণে জন্মিতে পারে না। উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে, বসার ভাগ অধিক হইয়া থাকে। ইহা আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, যে সকল পশুপক্ষিকে আমরা আহার দিয়া স্থূল করিতে যত্ন করি, তাহারা সকলেই প্রায় উদ্ভিজ্জভোজী। এমন কি আমিষভোজী কুক্কুর বিড়ালও উদ্ভিজ্জ-আহার-দ্বারা বিলক্ষণ পীবর হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত অধিক মাংসল হইয়া পড়িলে, উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি সামান্য পরিমাণে ভক্ষণ করা বিধেয়। আমিষ ভক্ষণে ক্ষুধার নিবৃত্তি অধিক হয় এবং পাকস্থলী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভার থাকে।

প্রসিদ্ধনামা ডাক্তার লিবিগ্ বলেন,—“আমিষভোজী-পশুগণ তাহাদের আহারের গুণেই উদ্ভিজ্জভোজী-পশুগণ-অপেক্ষা অধিকতর সাহসী ও উগ্রস্বভাব হইয়া থাকে।”

ইহা দেখা হইয়াছে যে, পশুশালায় রক্ষিত কোন ভল্লূক যতদিন কেবল রুটী আহার করিত, ততদিন তাহার স্বভাব ধীর ও নম্র ছিল; কিন্তু যে-অবধি তাহাকে কেবল মাংস আহার করিতে দেওয়া হইল, সে সেই-অবধি নিতান্ত অপকারক ও উগ্রপ্রকৃতি হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা ইউরোপ-বাসীগণ যে অধিকতর সাহসিক ও সমরপ্রিয়, আমিষ-ভোজনই বোধ হয়, তাহার এক প্রধান কারণ।

ক্ষুধা।—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শরীরের সমস্ত পদার্থ সতত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এই ক্ষতিপূরণজন্য নূতন পদার্থের আবশ্যকতা হয় বলিয়া ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া থাকে। আহার গ্রহণ করিয়া আমরা এই ক্ষুধা নিবৃত্তি করি।

ক্ষুধাদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, আহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং এই ক্ষুধায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা আহার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আহারের পরিমাণ সকলের পক্ষে সমান নহে। ঋতু-পরিবর্ত্তন, পরিশ্রম, অভ্যাস, বয়ঃক্রম প্রভৃতি কারণে ক্ষুধার তারতম্য হইয়া থাকে। অন্য কাল-অপেক্ষা শীত-কালে আমাদের ক্ষুধার বৃদ্ধি অধিকতর পরিমাণে হয়। অলস-অপেক্ষা শ্রমজীবী ব্যক্তির ক্ষুধা অধিকতর হইয়া থাকে। অভ্যাস-বশতঃ অনেকে অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারে। শিশু ও বৃদ্ধ-অপেক্ষা যুবাগণ অধিকতম পরিমাণে আহার করিয়া

থাকে। ক্ষুধাই আমাদিগের আহারনির্দ্দিষ্টকরণের একমাত্র উপায়। ক্ষুধাশান্তি হইলে, আহারে আর বড় স্পৃহা থাকে না। ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে, ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল কি না, অনায়াসেই বুঝা যায়; এবং ক্ষুধাশান্তি হইলে, সহজেই আহারে ক্ষান্ত হইতে হয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি আহার করিলে কিম্বা আহারীয় দ্রব্য নানাপ্রকার ও সুস্বাদু হইলে রসানুভব-জন্য ক্ষুধা-অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আহার করিলে অতি-ভোজন-দোষজন্য প্রায় কষ্ট পাইতে হয়।

পরিমিতভোজিতা। অল্প আহার-অপেক্ষা অতিভোজন-দোষই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। আস্বাদনের বশীভূত হইয়া, অধিক মসলাযুক্ত গুরুপাক ব্যঞ্জনাদি অনেক পরিমাণে ভোজন না করিয়া, পরিমিতরূপে সুখাদ্য আহার করিতে পারিলে রোগগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বড় হয় না। কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া আহার করা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, উদর স্ফীত যেপর্য্যন্ত না হয়, ততক্ষণ আহার করা কর্ত্তব্য। এই কুবুদ্ধির বশীভূত হইয়া, এদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোক শিশুদিগকে দুগ্ধ বা ভাত খাওয়া-ইবার সময়ে যেপর্য্যন্ত তাহাদের পেট উঠিতে না দেখেন, তত-ক্ষণপর্য্যন্ত তাহাদিগকে খাওয়াইতে ক্ষান্ত হয়েন না। তাঁহারা ভাবেন যে, অধিক আহার দিলে শিশুগণ শীঘ্র পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে। এই অতিভোজনদোষে অনেক শিশু উদরাময় ও অন্যান্য ক্লেশকর রোগে কষ্ট পাইয়া থাকে এবং অল্প বয়সেই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। ইহা অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়

যে, অপরিমিতভোজী ব্যক্তিদিগের দেহ প্রায় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে; অতিভোজনদোষে উদরস্থ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হওয়াতে উহার সারাংশ. শরীরের কার্য্যে নিযুক্ত হয় না, সুতরাং দেহের ক্ষীণতা ও দৌর্ব্বল্য ক্রমে উপস্থিত হইতে থাকে।

যে কতিপয় রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া থাকে, তাহারা প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয; সেই রসে যে পরিমাণে ভুক্তদ্রব্য পাক হইতে পারে, সেই পরিমাণের অধিক হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক না হইয়া, পীড়াদায়ক হইয়া পড়ে। অতএব পরিমিতরূপে আহার করাই সর্ব্বপ্রকারে বিধেয়। সাধারণতঃ দিবারাত্রির মধ্যে এক সের খাদ্যদ্রব্য ও এক হইতে দুই সের পর্য্যন্ত পানীয় দ্রব্য, একজন সবল যুবার পক্ষে যথেষ্ট আহার। বাঙ্গালিদিগের পক্ষে এক পোয়া বা পাঁচ ছটাক চালের ভাত, এক পোয়া ময়দার লুচি বা রুটী, আধ ছটাক ঘৃত, দুই ছটাক দাল, তদুপযুক্ত মৎস্য ও তরকারি এবং এক সের দুগ্ধ, প্রত্যহ আহার করা হইলে যথেষ্ট বল-কারক ও স্বাস্থ্যপ্রদায়ক হইতে পারে।

রন্ধনের উপযোগিতা। আস্বাদপ্রদ ও পরিপাকোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমরা অনেক দ্রব্য রন্ধন করিয়া থাকি। কাঁচা অবস্থায় যে সকল দ্রব্য আমরা জীর্ণ করিতে না পারি, সেই সকল রন্ধন করিলে ভক্ষযোগ্য ও সুস্বাদু হয়। চাল, ময়দা, তরকারি, মাংস, মৎস্য প্রভৃতি দ্রব্য-সকল কাঁচা অবস্থায় ভক্ষযোগ্য নহে, এবং খাইলেও অনায়াসে পরিপাক হয় না, কিন্তু উহা

রন্ধন করিলে অতি সুস্বাদু ও সহজে পরিপাক হয়। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, রন্ধনদোষে লঘুপাক দ্রব্য-সকল গুরুপাক হইয়া উঠে। অধিক ঘৃত, তৈল বা মসলার সহিত কোন দ্রব্য বাহুল্যরূপে রন্ধন করিলে, তাহা অধিক সুস্বাদু হইতে পারে, কিন্তু সহজে পরিপাক হয় না।

আহারের সময়-নিরূপণ। খাদ্যের পরিমাণ ও তাহার উপযুক্ততা স্থির করা যেমন প্রয়োজনীয়, আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকাও তদ্রূপ আবশ্যকীয়। প্রত্যহ এক সময়ে এবং যথাসময়ান্তরে আহার না করিলে, স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ হানিজনক হইয়া থাকে। অধিকাংশ মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রত্যহ তিনবার আহার করা প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচ বা ছয় ঘণ্টা অন্তরে দিনের মধ্যে তিনবার আহার করা নিতান্ত মন্দ নহে। আমাদের দেশেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু অনেকে অন্য প্রকার নিয়মে আহার করিয়াও সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় বিধবা স্ত্রীলোকেরা ও ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে অনেকে দিনান্তে একবার অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ লোকেও এক সন্ধ্যা আহার করে। অনেকে আবার প্রত্যহ দুই বারের অধিক আহার করে না। বিশেষ অনুসন্ধান-দ্বারা শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পরিপাক হইয়া স্থানান্তরিত হইতে অন্ততঃ চার ঘণ্টা লাগে। পরিপাকান্তে এই চারি ঘণ্টার অতিরিক্ত আরও এক বা দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত পাকযন্ত্রকে বিশ্রাম না দিয়া পুনরায় আহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এই

নিমিত্ত একবার আহার করিলে, অন্ততঃ তাহার পাঁচ বা ছয় ঘণ্টা বিলম্বে পুনরায় আহার করা উচিত। দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর কিছু কিছু আহার করা অতিশয় অন্যায়; কারণ, এক আহারের পরিপাক কার্য্য শেষ না হইতে হইতেই পুনর্ব্বার আহার করিলে পাকস্থলীকে বিশেষ কষ্ট দেওয়া হয়, এবং উভয় আহারের পরিপাক-কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। প্রথমবার প্রাতঃকালে বেলা ৯ টার সময়ে আহার করিয়া, দ্বিতীয়বার বৈকালে ৩ টার সময়ে ও তৃতীয়বার রাত্রি ৯ টার সময়ে আহার করিবার প্রথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। প্রায় এই নিয়মেই আমাদের মধ্যে অনেকেই আহার করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের অনতিবিলম্বে কিছু আহার করা কর্ত্তব্য। যেহেতু এ সময়ে শরীর ও পাকস্থলীর তেজ কম থাকে, এবং নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্ম হইয়া শরীরে জলীয় ভাগের অভাব হয়, এই নিমিত্ত শুষ্ক-দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার না করিয়া, পানীয় দ্রব্যের সহিত অল্প পরিমাণে লঘু খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মিছিরি বা চিনির-পানা, দুগ্ধ, চা, কাফি ইত্যাদি পানীয় দ্রব্য এই সময়ের বিশেষ উপযোগী। অন্য সময়ের আহারের নিয়ম সকল-জাতির মধ্যে সমান নহে। বাঙ্গালিজাতির মধ্যে অধিকাংশ লোকে প্রাতঃকালে প্রায় ৯ টার সময়ে পরিতুষ্টরূপে অন্নব্যঞ্জন আদি আহার করিয়া, বেলা ১ বা ২ টার সময়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে, পরে রাত্রিকালে ৮ বা ৯ টার সময়ে পুনরায় অন্ন, লুচি বা রুটী যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকে। ইংরাজেরা প্রাতঃকালে প্রায় ৯ টার সময়ে রুটী, মাখম, যৎকিঞ্চিৎ মাংস ইত্যাদি আহার করিয়া,

বেলা ১ বা ২ টার সময়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে, পরে অপরাহ্নে ৫ বা ৬ টার সময়ে ভাত, রুটী, মাংস প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিয়া, রাত্রিকালে উহা-অপেক্ষা অল্পতর পরিমাণে লঘুদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। কেহ বা মধ্যাহ্নে একবার পরিতুষ্টরূপে আহার করিয়া, রাত্রিকালে যৎসামান্য জলযোগ করিয়া থাকে। আবার পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ লোকে প্রত্যহ কেবল এক সন্ধ্যা আহার করিয়া থাকে।

আহারান্তেই নিদ্রার নিষেধ। গুরুতর আহারের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়। নিদ্রাবস্থায় শারীরিকক্রিয়া-সমূহ স্বভাবতঃ শিথিল থাকাতে, পরিপাক-কার্য্য যথানিয়মে সমাহিত না হইয়া রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। আবার অনাহারে পাকস্থলী শূন্য অবস্থায় রাখিয়া, নিদ্রা যাইলে ক্লেশকর হইতে পারে।

নিদ্রার সময়ে পরিপাকক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হইলেই, অপাক দোষ জন্মে। অপাকদোষের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া কুস্বপ্ন প্রভৃতি উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত রাত্রিকালের আহার সন্ধ্যার সময়ে করিলেই ভাল হয়, তাহা হইলে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেই সে আহার জীর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

প্রচলিত-আহার্য্য। এক্ষণে যে সকল আহারীয় দ্রব্য সচরাচর এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, তাহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

চাল, গোম, কলায়, শস্য ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ-বলকারক দ্রব্য এবং মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদি প্রাণিজ বলকারক দ্রব্য

প্রভৃতির বিষয় পূর্ব্বে একরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তরকারী, শাক, ফল, মূল ইত্যাদি অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি পশ্চাতে বিবরিত হইতেছে।

তরকারী। ইহা নানা-প্রকার; গোলআলু, রাঙ্গাআলু, চুপ্‌ড়ীআলু, পটোল, বেগুণ, কাঁচ্‌কলা, মানকচু, গুঁড়ি-কচু, ওল, উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গে, ঢ্যাড়্‌স, লাউ, দেশী ও বিলাতী কুষ্মাণ্ড, ধুতুল, শশা, কাঁকুড়, শিম, কাঁচা পেপিয়া, মোচা, থোড়, এঁচোড়, কাঁটালবিচি, ডুম্বুর মূলা, সালগাম, ওলকপি, গাজর, কোঁড়ক, মাদার, চাল্‌তা, তেঁতুল, কলাইসুঁটি, বরবটিসুঁটি, সজিনাথাড়া ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে গোলআলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহা পুষ্টিকর এবং বৎসরের সকল সময়েই পাওয়া যায়। মানকচু, ওল, ও পেপিয়া সারক এবং অর্শ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। উচ্ছে, মোচা, ডুমুর, মূলা পিত্তনাশক। লাউ, কুম্‌ড়া, শসা, এঁচোড় ইত্যাদি কচি অবস্থায় উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া খাইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু পক্ক ও অর্দ্ধসিদ্ধ হইলে, পীড়াদায়ক হইতে পারে। তরকারীর হরিদংশ অর্থাৎ খোসা সহজে পরিপাক হয় না, এ নিমিত্ত পটোল, আলু, বেগুণ প্রভৃতির খোসা ও বীজ পরিত্যাগ করা বিহিত।

শাক। ইহাও নানাপ্রকার; পালম, বীটপালম, চুকো-পালম, চাঁপানটে, ডেঙ্গোনটে, কন্‌কানোটে, সুল্‌পো, গিমে, সুস্‌নী, পল্‌তা, কলম্বী, হিংচা, কচুশাক, সজিনা, লাউ-কুমড়া-শসা-ও-কাঁকুড়শাক, পুঁই, পাট, বেতো, কলাই-

সুটী-শাক, তেউড়েশাক, মূলাশাক, সরিষাশাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ক্ষুদে ও বড় নুনি, সাঞ্চেশাক, গাঁদালপাতা, নিমপাতা, পুদিনাশাক, ইত্যাদি।

শাক আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে থাকা আবশ্যক; কিন্তু উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া উহার অসারভাগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তিক্তরসবিশিষ্ট শাক-সকল বিশেষ উপকারী। হিংচা, কলমি, পলতা ইত্যাদি পিত্তনাশক।

ফল। এতদ্দেশে যত প্রকার ফল আছে, বোধ হয় এত প্রকার ফল অন্য কোন দেশে নাই। ইহার মধ্যে কতিপয় ফল অতি সুস্বাদু ও মনোহর; এবং তাহাদের তুল্য ফল, বোধ হয় অন্য কোন দেশেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আম্র, দাড়িম্ব, লিচু, গোলাপজাম, কালজাম, আতা, আনারস, পেয়ারা, রম্ভা, কমলালেবু, পেপিয়া, নারিকেল, কাঁটাল, ইক্ষু, তরমুজ, ফুটি, বেল ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট ফলের মধ্যে গণ্য।

আর আর অনেক প্রকার ফল আছে; যথা, টোপা ও নারিকেলী কুল, কাঁকুড়, নোনা, তুঁত, শসা, পানীফল, কেসুর, জামরুল, কতবেল, তালশাঁস, তাল, বাতাবিলেবু, পাতি ও কাগজি প্রভৃতি লেবু, খর্জ্জুর, পিচ, সপেটা, গাব, শাঁকআলু, টেপারি, পাতবাদাম, আমড়া ইত্যাদি।

এই সকল দেশীয় ফল ভিন্ন আমরা আরও কতকগুলি বিদেশীয় উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি, যথা ম্যাঙ্গষ্টিন, আপেল, বেদানা, আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, আকরোট, খোবানি, ছোয়ারা, কিশ্‌মিশ্‌, মনক্কা, খরমুজা ইত্যাদি।

ফলমাত্রেই প্রায় কিছু না কিছু সারক। আম্র, কাঁটাল, পেঁপিয়া, নারিকেল, ফুটি, পেয়ারা, ইক্ষু ইত্যাদি বিলক্ষণ সারক। ফল সুপক্ক হইলে, খাওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল ফল কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণ করা যায়, তাহার রস খাইয়া শিটা ত্যাগ করা উচিত; যেমন পেয়ারা, শশা, জামরুল, শাঁক-আলু ইত্যাদি। অল্পকালীন দাড়িম, আনারস, কচি-নারিকেল ইক্ষু, কাঁচাপেয়ারা, কচিশসা, পানিফল, কেশুর, শাঁকআলু ইত্যাদি কয়েকপ্রকার শৈত্যগুণবিশিষ্ট ফল বড় মুখ-রোচক, এবং শিটা ত্যাগ করিয়া অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে বিশেষ অপকারক নহে। বেল ধারকগুণবিশিষ্ট, এজন্যে উদরাময় রোগে বিশেষ উপকারী। বাদাম, পেস্তা, আক্রোট ইত্যাদি তৈলময় ফল-সকল পুষ্টিকর, কিন্তু অধিক ভক্ষণ করিলে পীড়াদায়ক হইতে পারে।

মিষ্ট সামগ্রী। ইক্ষু ও খর্জ্জুর রস-হইতে দুই প্রকার গুড় প্রস্তুত হয়,—খেজুরে ও একো-গুড়। এই গুড় পরিষ্কৃত করিয়া, শর্করা উৎপন্ন হয়। চিনি জ্বাল দিয়া রস করিয়া মিছিরি প্রস্তুত হয়। চিনিদ্বারা আমরা নানাবিধ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়া থাকি। ছানা, নারিকেল, ক্ষীর, সর প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া সন্দেশ, মনোহরা, চন্দ্রপুলী, ক্ষীরেরছাঁচ, সরপুরা, বর্‌ফি প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ঘৃত-পক্ক নানাবিধ সামগ্রী চিনির সংযোগে সুস্বাদযুক্ত হয়। মিষ্টান্ন অতি মুখপ্রিয়; কিন্তু অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে উদরাময়, অজীর্ণ, অম্ল, কৃমি ইত্যাদি রোগ জন্মে।

মধু আর একটি মিষ্ট-দ্রব্য। ইহা মধুমক্ষিকার চক্রহইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধু অতি মুখপ্রিয় এবং অল্প পরিমাণে পান করিলে উপকারও আছে। মিষ্ট-দ্রব্য দ্বারা আমাদের শরীরের তাপ উদ্ভাবিত হয়। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকাল-অপেক্ষা শীতকালে অধিকতর পরিমাণ মিষ্ট-দ্রব্য সহ্য হয়। চিনি সহজে পরিপাক হয়। বালকেরা গুড় খাইতে বিশেষ ভালবাসে, এবং অল্প পরিমাণে খাইলে ক্ষতি নাই।

জলপান। তণ্ডুল বা ধান্য ভর্জ্জিত করিয়া কতিপয়প্রকার জলপানীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মুড়ীর চাল ভাজিয়া মুড়ী হয়। খইয়ের ধান ভাজিয়া খই হয়, এবং খই গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুড়কী হয়। ধান্য অল্প সিদ্ধ করিয়া ঢেঁকিতে কুটিলে চিঁড়া হয়। মটর, ছোলা ও কলায় ভাজিয়া মটরভাজা, ছোলাভাজা ও কুট্‌কলায় হয়। ছোলাহইতেই চানাচুর প্রস্তুত হয়। ইহারা সহজে পরিপাক হয় না, এবং নিকৃষ্ট খাদ্যের মধ্যে গণ্য। মুড়ী, খই ও ভাজাচিঁড়া অতি লঘু। মুড়কী ও কাঁচাচিঁড়া তত সহজে পরিপাক হয় না। ভাজাসামগ্রীমাত্রেই সহজে জীর্ণ হয় না।

পিষ্টক। চালের গুঁড়ী, কলায় ও মুগের দাল, রাঙ্গা ও গোলআলু, নারিকেলকুরা, ছানা, ক্ষীর, বাদাম, পেস্তা-প্রভৃতি দ্রব্য তৈল, ঘৃত, চিনি বা গুড়ের সহিত পাক করিয়া নানাবিধ পিষ্টক আমরা প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহারা প্রায় গুরুপাক এবং সহজে জীর্ণ হয় না।

সাগুদানা, আরারুট, যবমণ্ড, অন্নমণ্ড-প্রভৃতি দ্রব্য-সকল অতি লঘু এবং পীড়িত অবস্থায় বিশেষ উপকারী।

মোরব্বা। আমাদের দেশে নানাপ্রকার মোরব্বা ও চাটনী ব্যবহার হইয়া থাকে। আম্র, লেবু, বিল্ব, আমলকী, আনারস-প্রভৃতি ফলের মোরব্বা বিশেষ উপকারী ও সুখরোচক। ইহাতে অরুচি নিবারিত হয়, ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

চাট্নীও নানাপ্রকার। লবণাক্ত, অম্ল, তৈলাক্ত, মিষ্ট, ও কটু। ইহারা পাকযন্ত্র উত্তেজিত করিয়া, পাককার্য্যের সহায়তা প্রদান করে।

কতকগুলি সচরাচর আহারীয় দ্রব্য কত সময়ের মধ্যে পরিপাক হয়, নিম্নেলিখিত হইল।

দ্রব্য।	পরিপাকসময়।	দ্রব্য।	পরিপাক সময়।
অন্ন	১ ঘণ্টা।	ডিম্ব (সিদ্ধ) ...	৩। ৩০
সাগু	১। ৪৫	মাতৃ-স্তন্য ...	২
গোল-আলু (সিদ্ধ) ...	৩। ৩০	গাভিদুগ্ধ (সিদ্ধ)	২
ঐ (ভাজা বা পোড়া)	২। ৩০	ঘৃত	৩। ৩০
রুটী (ময়দা) ...	৩। ৩০	মাংস ...	৩। ৩০
ডিম্ব (কাঁচা) ...	২	মাংসের ঝোল	৩

শিশুর খাদ্য।—জীবনের অন্যান্য অবস্থার অপেক্ষা শৈশবকালে বিশিষ্টতর সাবধানতা ও যত্নের সহিত শরীরপালন করা আবশ্যকীয়। অতিভোজন ও অখাদ্যভোজন-জন্যই অধিকাংশ শিশু রোগগ্রস্থ ও অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের আহারের প্রতি বিশিষ্টরূপে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসবের পর প্রায় তিন দিবসপর্য্যন্ত প্রসূতির স্তন-হইতে

দুগ্ধ নির্গত হয় না, কেবল টিপিলে যৎসামান্য একপ্রকার দুগ্ধবৎ রস নির্গত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সদ্যোজাত শিশু ঐ কয়েক দিবস মাতার স্তনদুগ্ধহইতে বঞ্চিত হয়। মাতৃস্তন্যের পরিবর্ত্তে আমরা ঐ কতিপয় দিবস শিশুকে গাভীদুগ্ধ পান করাইয়া থাকি। শিশুদিগকে এই সময়ে কিরূপ আহারীয় প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিবার পূর্ব্বে, উহাদিগকে কোন প্রকার ভক্ষ্য দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায় শিশুর পাকযন্ত্রের ক্রিয়া এককালে বন্ধ থাকে, অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহার কোমল পাকযন্ত্র আহারীয় দ্রব্যদ্বারা সহসা উত্তেজিত করিতে হইলে পীড়াদায়ক হইতে পারে এবং প্রসবের পরক্ষণে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ না থাকাতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, যেপর্য্যন্ত মাতার স্তনে দুগ্ধ আগত না হয়, সেপর্য্যন্ত সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে কোনপ্রকার আহার বা সামান্য লঘু আহার ভিন্ন গাভীদুগ্ধের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্যের বিধান করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই নিমিত্ত ভূমিষ্ঠ হইলে কোনপ্রকার খাদ্য না দিয়া শিশুদিগের মুখে কেবল মাতৃস্তন লাগাইয়া দিবে। এই সময় স্তনহইতে যে সামান্য দুগ্ধবৎ রস নির্গত হয় তাহাই উহাদের পক্ষে যথেষ্ট আহার। পরে বিশুদ্ধ জল, কিম্বা উহা কিঞ্চিৎ চিনি বা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে গরম করিয়া পান করাইয়া দিলে পাকযন্ত্রের বিশেষ কষ্ট হইবে না। তিন চারি দিবস পরে মাতৃস্তনে দুগ্ধ আসিলে ঐ দুগ্ধই শিশুর প্রকৃত এবং একমাত্র আহার হইবে।

অনেকেরই এরূপ সংস্কার আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে উহাকে কিঞ্চিৎ আহারীয় দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ গলা শুষ্ক হইয়া ক্লেশকর হইতে পারে। পাছে ক্ষুধাভাবে নবজাত শিশুর কষ্ট হয়, এই নিমিত্ত এদেশের স্ত্রীলোকেরা গৃহে পূর্ণগর্ভা রমণী থাকিলে, কিঞ্চিৎ গাভীদুগ্ধ রাত্রিকালের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া থাকেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহাকে গাভীদুগ্ধ পান করান হয়। এবং শিশু ক্রন্দন করিলেই ক্রন্দন যে ক্ষুধারই একমাত্র চিহ্ন, ইহাই বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই কুসংস্কার-হেতু প্রসূতিগণ তাহাদিগের নবজাত শিশুগণের কোমল পাকযন্ত্র এই গুরুপাক দ্রব্য-দ্বারা পূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে অকারণ কত ক্লেশ দেন! অপাকদোষজন্য শিশু ক্রন্দন করিলে, ক্ষুধার নিমিত্ত এরূপ করিতেছে স্থির করিয়া, পুনরায় দুগ্ধ পান করান এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর পীড়া বৃদ্ধি করিয়া দেন। এইরূপ পালনে যে কত শিশু রোগগ্রস্ত ও অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মাতার স্তনে দুগ্ধ আসিলে, সেই দুগ্ধই শিশুর প্রকৃত আহার্য্য। আটহইতে বারমাস-পর্য্যন্ত শিশু স্তনদুগ্ধ পান করিবে। স্তনদুগ্ধ প্রচুর না হইলে, গাভী বা গর্দ্দভীর দুগ্ধ কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারা যায়। শিশুর দন্ত বহিস্কৃত হইতে আরম্ভ হইলে, উহা বুঝিতে হইবে যে, দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে অন্যপ্রকার লঘু আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সময় দুগ্ধের সহিত সাগু, আরারুট, টাপিওকা বা অন্য প্রকার শ্বেতসার মিলিত করিয়া সেবন করাইলে শিশু বলিষ্ঠ হইতে পারে এবং তদ্ভিন্ন বয়োঃ-

বৃদ্ধির সহিত ক্রমে মৎস্য, সিদ্ধ-আলু, গজা, মোহনভোগ, পাঁউ-রুটী, বিস্কুট ইত্যাদি লঘু খাদ্য অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের প্রসূতিরা, স্নেহবশতঃ তিন চারি বৎসর বা অধিক কাল-পর্য্যন্ত স্তন পান করাইয়া শিশুদিগকে রোগগ্রস্থ করেন, এবং গাভীদুগ্ধ-ভিন্ন অন্যপ্রকার আহার দিতে কুণ্ঠিত হন।

কোন কারণে শিশু মাতার স্তনদুগ্ধ-হইতে বঞ্চিত হইলে, উহাকে সম-অবস্থাপন্ন প্রসূতির স্তনদুগ্ধ পান করান বিধেয়। তাহার অভাবে গাভী, ছাগী বা গর্দ্দভীর দুগ্ধ-দ্বারা শিশুগণকে পালিত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে গর্দ্দভীদুগ্ধের গুণ প্রায় মাতৃস্তন্যের ন্যায়। গাভীদুগ্ধে চিনি ও জলের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প আছে বলিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিনি ও জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

পানীয়।

পিপাসা। শরীরের পক্ষে পানীয় দ্রব্যের যে বিশেষ প্রয়োজন, পিপাসাই তাহার একমাত্র চিহ্ন। শরীরের সকল উপাদান-মধ্যে জলই প্রধান। সমস্ত শরীরের তিন ভাগের দুই ভাগ জল এবং রক্তের চারি ভাগের তিন ভাগ জল। শরীরের মধ্যে যে পরিমাণে জল থাকা আবশ্যক, তাহার অল্পতা হইলেই, পিপাসা উপস্থিত হয় এবং জল পান করিয়া আমরা তাহার নিবৃত্তি করি। ক্ষুধা-অপেক্ষা পিপাসার যাতনা অধিকতর বোধ

হয়। অনাহারে বরং কিছুদিন জীবিত থাকা যায়, কিন্তু জল-পানে বঞ্চিত হইলে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র মৃত্যু হয়।

জলপান। শরীরের জলীয় ভাগ ত্বকের অসংখ্য লোমকূপ-দ্বারা ঘর্ম্মাকারে, ফুস্ ফুস্-দ্বারা বাষ্প-আকারে এবং মূত্রাশয়-দ্বারা মূত্ররূপে নিয়ত নির্গত হইতেছে। অধিক পরিশ্রম করিলে, বা উত্তাপিত হইলে, শরীর-হইতে জলীয় ভাগ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া পিপাসার বৃদ্ধি করিয়া দেয়। গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মাদির আতিশয্যের নিমিত্ত শীতকাল-অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে জল পান করিতে হয়। পিপাসা উপস্থিত হইলে জল পান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এককালে অধিক পান করিলে পীড়াদায়ক হইতে পারে। পাকস্থলীতে জলীয় পদার্থের অল্পতা হইলে ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হইতে পারে না। জল বিলক্ষণ দ্রাবক। অজীর্ণদোষ-জন্য কষ্ট হইলে, উপযুক্ত পরিমাণে জলপান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। আহার-কালে বা উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে অধিক পরিমাণে জল পান করা উচিত নয়। যে সকল শারীরিক পাচক রসের সংযোগে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হয়, সে সকল রস অতিরিক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হইলে, নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পরিপাক-কার্য্যের বিঘ্ন করিতে পারে।

অধিক পরিশ্রম করিয়া বা উত্তাপ-পীড়িত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইলে, তৎকালে শীতল জল খাওয়া উচিত নয়। যে সময় ত্বক্-হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে থাকে, তখন ত্বকের দিকে রক্তের গতি হয়। অতএব এসময়ে শীতল জল উদরস্থ করিলে, রক্তের গতি

ত্বকের দিক্‌ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌, মস্তিষ্ক প্রভৃতি প্রধান যন্ত্র-সকলের দিকে ধাবমান হইয়া, উহাদিগকে পীড়িত করিতে পারে। এই কারণে উষ্ণ পানীয় বা ভক্ষ্যদ্রব্য উদরস্থ করিবার অব্যবহিত পরেই অধিক শীতল জলীয় দ্রব্য পান করাও অবৈধ। অধিকন্তু দৈহিক পরিশ্রমের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য। অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল পানীয় দ্রব্য উদরস্থ করিলে, পাকস্থলী পীড়িত হইয়া পাককার্য্যের বিঘ্ন জন্মাইতে পারে।

জলের পরিশুদ্ধতা। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং উষ্ণপ্রধান দেশীয় লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুরা প্রভৃতি অন্যান্য পানীয় দ্রব্য-অপেক্ষা শুদ্ধ জল অধিকতর স্বাস্থ্যকর। জলপানকারিদিগকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে জল আমাদের শরীরের জীবনস্বরূপ এবং যাহার বিশুদ্ধতার উপর আমাদিগের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, তাহা বিশুদ্ধাবস্থায় প্রায়প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুষ্করিণীর আবদ্ধ জল-অপেক্ষা নদীর স্রোতোবহ জল অনেকতর পরিমাণে ভাল। পল্লীগ্রামের কোন কোন দীর্ঘিকার বা পুষ্করিণীর জল ভাল হইতে পারে; কিন্তু জলে নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া, উহাকে যন্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে বিশোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে, বিশেষ উপকারী ও স্বাস্থ্যপ্রদ হইতে পারে। যে সকল পুষ্করিণী বৃক্ষাচ্ছাদিত নহে এবং যাহার তলা বালুকাময়, তাহার জল প্রায় বিশুদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু মনুষ্যদ্বারা অধিক ব্যবহৃত হইলে, উহাও ক্রমে

দূষিত হইয়া পড়ে। স্রোতের উত্তম জলও বর্ষাকালে নানাপ্রকার দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপরিষ্কৃত হয়। সমুদ্রের বা উহার নিকটবর্ত্তী নদীর জল অধিক লবণাক্ত বলিয়া ব্যবহার্য্য নহে।

জলবিশুদ্ধীকরণ প্রণালী। কাষ্ঠের অঙ্গারচূর্ণ ও বালুকা-রাশির মধ্যদিয়া জল প্রবিষ্ট করাইলে, উহার দূষিত অংশ-সকল ঐ বালুকারাশি ও অঙ্গারচূর্ণ আকর্ষণ করিয়া জলকে পরিষ্কৃত করে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া "ফিল্‌টার" নামক জল-আধার অল্প পরিমাণে জল পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। এই ফিল্‌টারের মধ্যে অঙ্গার ও বালুকা থাকে; উহাদের মধ্যে দিয়া জল নির্গত হইয়া পরিস্কৃত হয়।

আর একটি সহজ উপায়ে অধিক জল এইরূপে পরিষ্কৃত করা যাইতে পারে। উপর্য্যুপরি চারিটী কলসী বসান যাইতে পারে এমন একটি বংশের বা কাষ্ঠের পেতেনা নির্ম্মাণ করিয়া, সারী সারী চারিটী কলসী তাহার উপরে রাখিতে হয়। তিনটী কলসীর তলায় ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া, সর্ব্বোপরি প্রথম কলসীটী খালি রাখিতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলসী অঙ্গারচূর্ণ ও বলুকারাশিদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, চতুর্থ কলসীটীর মুখে ঘনবস্ত্র বাঁধিয়া খালি রাখিতে হয়। জল উত্তপ্ত করিয়া সর্ব্ব-উপরের কলসীতে ঢালিয়া দিলে, উহা ছিদ্রদ্বারা অল্পে অল্পে দ্বিতীয় কলসীতে পতিত হয়। সেখানে বালুকা ও অঙ্গারচূর্ণদ্বারা বিশোধিত হইয়া তৃতীয় কলসীতে পতিত হয়; সেখানেও ঐরূপ বালুকা ও অঙ্গারচূর্ণদ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়া

অবশেষে চতুর্থ কলসীতে পতিত হইয়া অবস্থিতি করে এবং ব্যবহারের উপযোগী হয়।

এক্ষণে এই প্রণালীতে কলের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা ও অন্যান্য নগরীতে ব্যবহৃত হইতেছে। আমরা এই পরিশোধিত জলকে কলের জল বলিয়া থাকি। ইহা অতিশয় পরিস্কৃত ও স্বাস্থ্যকারক।

জলবিশুদ্ধীকরণের অন্যবিধপ্রক্রিয়া। জল অধিক উত্তপ্ত করিলে যে বাষ্প উদ্‌গত হয়, তাহা নলমধ্যে ধারণ করিয়া শীতল জলপূর্ণ পাত্রে রাখিলে, পুনর্ব্বার জল হইয়া নির্গত হয়; ইহারই নাম 'চুয়ান জল'। চুয়ান জল সকল জল-অপেক্ষা অধিকতম পরিস্কৃত। বৃষ্টির জল প্রায় চুয়ান জলের ন্যায় পরিস্কৃত।

জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, গন্ধ বা আস্বাদ-শূন্য। জলে দুই প্রকার ক্লেদ থাকে—মিলিত ও মিশ্রিত।

মিলিত ক্লেদ। ক্ষণকাল জলে ভাসমান থাকিয়া ক্রমে আপনাহইতে তলায় পতিত হইয়া যায়।

মিশ্রিত ক্লেদ। জলের সহিত এককালে সংযুক্ত থাকে, এবং অগ্নি বা কোন রাসায়নিক পদার্থের সংযোগ ভিন্ন উহা স্বতন্ত্র বা নষ্ট হয় না।

চুণ, বালুকা বা খড়ী জলে মিলিত করিলে, উহা ক্ষণকালপরে তলায় পড়িয়া যায়, কিম্বা ছাঁকিয়া জলহইতে স্বতন্ত্র করা যায়। লবণ বা চিনি জলে মিশ্রিত করিলে, উহা দ্রব হইয়া জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, এবং বালুকা বা খড়ীর ন্যায় সহজে জলহইতে স্বতন্ত্র করা যায় না।

কর্দ্দম বা বালুকামিশ্রিত ঘোলা জল শীঘ্র পরিষ্কৃত করিতে হইলে, পাঁচ সের জলে তিন রতি ফট্‌কিরী মিশ্রিত করিলে বার ঘণ্টার মধ্যে কর্দ্দম নীচে থিতিয়া জল নির্ম্মল হইয়া যায়। কতক ফল (যাহাকে সচরাচর নির্ম্মলী বলে) জলপাত্রের গাত্রে ঘর্ষণ করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিলেও জল ঐরূপ শীঘ্র পরিষ্কৃত হয়।

গ্রীষ্মাতিশয্য-বশতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরা অধিক পরিমাণে নানাপ্রকার পানীয় দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকাংশ পানীয় দ্রব্য বৃক্ষ-ও-ফলহইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা খর্জ্জুর-রস, ইক্ষু-রস, নারিকেল-জল ইত্যাদি।

খর্জ্জুর-রস। শীতকালে খর্জ্জুর বৃক্ষের অগ্রভাগের ত্বক্ ছেদ করিলে, এক প্রকার রস অল্পে অল্পে নিঃসৃত হয়। ইহা সুস্বাদু ও মিষ্ট। ইহাতে শর্করার ভাগ অধিক আছে বলিয়া ইহা পান করিলে, শরীরের তাপ উদ্ভাবন হয়। উত্তপ্ত খর্জ্জুর-রস, কিঞ্চিৎ ভেদক। ইহাকে চলিত কথায় 'তাতারসী' বলে। এই রস জ্বাল দিয়া খর্জ্জুর-গুড় প্রস্তুত হয়।

ইক্ষু-রস। ইক্ষু পেষণ করিলে, উহা-হইতে রস নির্গত হয়। আকের রস অতিশয় মিষ্ট এবং কিয়ৎপরিমাণে ভেদক। অনেকে গ্রীষ্মকালে এই রস পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিয়া থাকে। আকের রস জ্বাল দিয়া 'একোগুড়' হয়। আক দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিলে, মুখে যে রস আইসে, তাহাতেও পিপাসা নিবারিত হয়। এবং অবাদি পীড়া-কালে ইহাদ্বারা পিপাসার অনেক শান্তি হয়। ইহা পিত্ত দমন করে।

তাল-রস। ইহা খেজুর্ রসের ন্যায় তালগাছের অগ্রভাগ-হইতে নির্গত হয়। প্রত্যুষে বা সন্ধ্যাকালে রস গাছহইতে পাড়িয়া, সেই দণ্ডে পান করিলে, সুস্বাদু লাগে ও মূত্ররোগ বিশেষে উপকারক হইয়া থাকে। এই রস ক্ষণেক রৌদ্রের তাপে থাকিলেই গাঁজিয়া তাড়ী হয়। তাড়ী বিলক্ষণ মাদক। অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা ইহা পান করিয়া মত্ত হইয়া থাকে। এই রসহইতে তালের মিছরী প্রস্তত হয়।

নারিকেল-জল। আমাদের দেশে নারিকেল একটি আশ্চর্য্য ফল। ইহার তুল্য জলপূর্ণ ফল আর কোন দেশেই নাই। জল প্রায় অর্দ্ধ পোয়া-হইতে অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত বা অধিক পরিমাণে একটি নারিকেলের অভ্যন্তরে থাকে। ডাব অর্থাৎ কচি নারিকেলের জল অতি সুস্বাদু ও মিষ্ট। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির পিপাসা যেরূপ ইহাতে নিবৃত্তি হয়, বোধ হয় এতাদৃশ আর কিছুতেই হয় না। ভিতরের শাঁস ঈষৎ পক্ক হইলে, অর্থাৎ 'নেয়াপাতি' অবস্থায়, ডাবের জল যেমন সুস্বাদু, অধিক পক্ক অর্থাৎ 'ঝুনা' হইলে, সেরূপ থাকে না এবং উহার গুণেরও ব্যত্যয় হয়। ডাবের জল অপেক্ষা ঝুনা নারিকেলের জল অধিকতর ভেদক। জ্বরাদি পীড়ার সময় ডাবের জল অতি উপাদেয় এবং পিপাসা, বমন বা গাত্র দাহের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

চিনির পানা। চিনি জলে ভিজাইয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া, আমরা সচরাচর পান করিয়া থাকি। ইহাতে পাকস্থলী শীতল রাখে এবং শরীর স্নিগ্ধ করে। বাতাসা ভিজান জলেরও এইরূপ গুণ।

মিছরীর পানা। মিছরী কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে গলিয়া যায় এবং ইহাতে একটি উত্তম পানীয় প্রস্তুত হয়। ইহা গরম ধাতুতে প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে, কোষ্ঠ পরিস্কার রাখে এবং শরীর স্নিগ্ধ করে। মিছরীর পানায় বাতিক দমন করে এবং নরম ধাতুতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে।

বেলের পানা। সুপক্ব বেলের শাঁস কিঞ্চিৎ অম্ল ও মিষ্ট দ্রব্যের সংযোগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, উদরাময়ের বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে মল সরল ও কোষ্ঠ পরিস্কার হয়। গ্রীষ্মকালের পক্ষে বেল অতি উপযুক্তফল।

তরমুজের পানা। তরমুজের রস কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অতি সুস্বাদু হয় এবং পিপাসা দূর করে। অধিক পরিমাণে পান করিলে পীড়াদায়ক হইতে পারে।

বেদানার রস। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহা অতি সুস্বাদু এবং উপকারক। পীড়িতাবস্থায় ইহার বিশেষ ব্যবহার হইয়া থাকে।

এই কয়েকটি দেশীয় পানীয় ব্যতীরেকে আর কতিপয়বিধ বিদেশীয় পানীয় এক্ষণে আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে। যথা—চা, কাফি, নানাবিধ সুরা ইত্যাদি।

চা। চীনদেশীয় এক প্রকার গাছের শুষ্ক পাতাকে চা বলে। এক্ষণে ইহার কৃষিকার্য্য অন্যান্য দেশে এবং ভারতবর্ষেও হইতেছে। ইহা দুই বর্ণের হইয়া থাকে, সবুজ ও কাল। এই শুষ্ক পাতা অধিক উষ্ণ জলে ক্ষণকাল ভিজাইয়া রাখিলে, পাতা সিদ্ধ হইয়া উহার সারভাগ জলে মিশ্রিত হয়। শুদ্ধ চার জল বা উহা দুগ্ধ ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া লোকে পান করিয়া থাকে।

আরবদেশীয় একপ্রকার ফলের বীজকে কাফি বলে। ইহার চাষ এক্ষণে আসিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই বীজ ভাজিয়া চূর্ণ করিতে হয় এবং চার ন্যায় উষ্ণ জলে ক্ষণৈককাল ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে ঐ জল ছাঁকিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিতে হয়।

আরব, তুর্ক, ফরাসি, ইংরাজ প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে চা ও কাফির অধিক ব্যবহার। ইহারা এই দ্রব্যদ্বয়ের এত প্রিয় যে, প্রতিদিন চা কিম্বা কাফি না পান করিলে পরিতৃপ্ত হয় না। তাহাদের সংস্কার এই যে, ইহা পান করিলে শরীরের ও মনের স্ফূর্ত্তি হয়, অধিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়, ক্লান্তি বিদূরিত হয়, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয় এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মে।

সবুজ চা কালঅপেক্ষা অধিকতর তেজস্কর এবং শরীরের পক্ষে অপকারক; এই নিমিত্ত কাল চাই অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে উহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবুজ চা মিশ্রিত করিলে উহা অধিক তেজস্কর হয়।

চা ও কাফি পান করিলে নিদ্রার হ্রাস হয় এবং বিনা কষ্টে অধিকক্ষণ জাগ্রত থাকা যায়। এই গুণ চাহইতে কাফিতে অধিকতর আছে। এই নিমিত্ত চা বা কাফি পান করিলে, অহিফেণ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের মাদকতার হ্রাস করে। চা, ঘর্ম্ম ও মূত্রোৎপাদক বলিয়া কফ, শ্লেষ্মা ও বাতরোগে বিশেষ উপকারী। চা বা কাফি গরম ধাতুতে সহ্য হয় না।

সুরা। ইহা নানাপ্রকার—বিয়ার্, পোর্ট, শেরি, ব্রাণ্ডি, শাম্পিন্, রম্, জিন্, হুইস্কি ইত্যাদি।

এই সকল পানীয় দ্রব্য শস্য, ফল, মূল, পত্রাদি-হইতে প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ সুরা ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুরার মাদকতাশক্তি আছে, এই নিমিত্ত সুরাপান শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর।

বিয়ার, যব কিম্বা হপ্ নামে একপ্রকার ইউরোপীয় তিক্ত লতার ক্বাথ গাঁজাইয়া প্রস্তুত হয়। ইহাতে সুরাসার অর্থাৎ আল্‌কোহল্ (Alcohol) অল্পপরিমাণে আছে ; ১০০ ভাগে ৬ হইতে ৭ ভাগের অধিক নহে।

পোর্ট, শেরি, মেডিরা, শাম্পিন্, ক্লারেট-প্রভৃতি সুরা, কয়েক প্রকার ফল, মূল ও পাতার শর্করাপূর্ণ রস গাঁজাইয়া প্রস্তুত হয়। আঙ্গুর ফলের রসহইতেই অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকলে সুরাসারের ভাগ অধিক আছে, ১০০ ভাগে ১২ অবধি ২৩ ভাগ পর্য্যন্ত।

ব্রাণ্ডি, রম, জিন্, হুইস্কি, আরাক্-প্রভৃতি তেজস্কর মদ, গাঁজান শর্করাবিশিষ্ট রস চুয়াইয়া প্রস্তুত করা হয়। ব্রাণ্ডি, গাঁজান আঙ্গুরের রস চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়। রম, গাঁজান আখের রসের গাদ ও কোতরা গুড় চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়। জিন্, গাঁজান ধান্যের রস চুয়াইয়া, তাহাতে জুনিপার নামে একপ্রকার ইউ-রোপীয় সুগন্ধ ফল মিশ্রিত করিয়া, প্রস্তুত হয়। হুইস্কি, গাঁজান যব বা অন্য শস্যের রস চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়। এই কয়েকপ্রকার সুরায় সুরাসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম পরিমাণে আছে ; ১০০ ভাগে ৫৩ ভাগেরও অধিক। তজ্জন্য ইহারা যেরূপ অধিক মাদক, সেইরূপ অধিক অনিষ্টকর।

সুরা প্রায় অধিকাংশই বিদেশীয়। ইহা এদেশের উপযোগী নহে। সুস্থ শরীরে সুরা বিষতুল্য। ইহা পান করিলে নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়, চিত্তের বিভ্রম ও বুদ্ধির ভ্রংশ ঘটে, চরিত্র কলুষিত হয় এবং মন দুষ্কর্ম্মে রত হয়। এই নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রকারকেরা সুরাপান এককালে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধুনা ইংরাজদিগের অনুকরণে সুরাপান আমাদের দেশে অতিশয় প্রচলিত হইয়া, মহৎ অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সুরানিবন্ধন নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্ম, উৎকট পীড়া, দরিদ্রতা, অকালমৃত্যু প্রভৃতি অতি শোচনীয় ব্যাপারসকল প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে।

সুরা উদরস্থ হইবামাত্র পাকস্থলীর শিরাদ্বারা শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং শীঘ্র সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হইয়া যায়। সুরাসেবনে অধিক আসক্ত হইলে পাকস্থলীর প্রায় হানি হয়। অজীর্ণদোষ, অরুচি, বমন ও অক্ষুধা-প্রযুক্ত শরীর প্রায় কৃশ হয় ও পাণ্ডুতা ধারণ করে; চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, এবং নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ উপস্থিত হয়। অধিক সুরা সেবনের বিষময় ফল যকৃতযন্ত্রে বিশেষ লক্ষিত হয়। যকৃতমধ্যে রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইয়া, উহার নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়, এবং অবশেষে পাকিয়া প্রাণনাশক হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যসকল-যন্ত্রাপেক্ষা স্নায়ু ও মস্তিষ্কের পক্ষে সুরা বিশিষ্টতম হানিজনক। অজ্ঞাত-কম্পন নামে উৎকট পীড়াটী অতিরিক্ত সুরাপানের একটি সাধারণ ফল। ইহাতে শরীরের সকল-শক্তির হ্রাস হয়, বুদ্ধির ভ্রংশ জন্মিয়া প্রলাপ উপস্থিত হয়, অঙ্গসকল

কম্পিত হইতে থাকে, নিদ্রা দূর হয়, এবং সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া নানাপ্রকার ক্লেশদায়ক ভয়ের উদয় হয়।

অধিককাল মাদক সেবনের আর একটি শোচনীয় ফল উন্মত্ততা। কাহার উন্মত্ততা চিরস্থায়ী এবং কাহার বা ক্ষণিক। কেহ সুরাপান করিলেই ক্ষণেককালের নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার ও বাতুলের ন্যায় ব্যবহার করে, অথবা জ্ঞানশূন্য হইয়া নিস্তব্ধরূপে পড়িয়া থাকে; এবং কাহার উন্মত্ততা বদ্ধমূল হইয়া চিরস্থায়ী হয়। সুরাপান করিলে প্রথম অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে উত্তেজিত হয়, কিন্তু অধিক পান করিতে করিতে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতে থাকে, এবং অবশেষে মদ্যপায়ী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পশুবৎ হইয়া পড়ে।

সুরার অতি অলৌকিক শক্তি। অল্প পান করিলে, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া মনোবৃত্তির তেজ বৃদ্ধি করে, এবং অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া আনন্দের উদয় হয়। রক্ত বেগে সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত শরীরকে উত্তপ্ত করে। শরীর বলিষ্ঠ ও রোগশূন্য বোধ হয়, এবং জ্ঞানের হ্রস্বতা দৃষ্ট হয়। ক্রমে অধিক পান করিলে, ইন্দ্রিয়-সকল বিকৃত হইতে থাকে; অঙ্গ ক্রমে অবশ হইয়া পড়ে; ভয় ও লজ্জা মনহইতে তিরোহিত হয়; এবং সকলপ্রকার গর্হিতাচরণ সহজসম্পাদ্য হইয়া উঠে। আরও অধিক পান করিলে, মস্তিষ্ক অতিরিক্ত উত্তেজিত হইয়া ঘূরিতে থাকে; বাক্‌শক্তির জড়তা হয়, জ্ঞানের লাঘব হয় এবং উন্মত্ততার প্রায় সকল লক্ষণই দৃষ্ট হয়। শরীর ও মন এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

সুরার মাদকতায় যে পরিমাণে শরীর ও মন উত্তেজিত হয়, মাদকতা দূর হইলে, শরীর ও মন সেই পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

সুরাসক্ত ব্যক্তিরা অল্প বয়সেই প্রায় বৃদ্ধ হইয়া পড়ে। যে যুবার ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম, তাহার কেশ পক্ক এবং মাংস শিথিল হইয়া, নিতান্ত বৃদ্ধের ন্যায় আকার হয়।

সমাজ-সম্বন্ধে সুরাসেবনের ফল অতি শোকাবহ।

একজন বিচারপতি বলিয়াছেন যে, যদি সুরাপান দোষ না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার বিচারকার্য্যের প্রায় আবশ্যকই হইত না। অন্য একজন লেখক বলেন, পাঁচ ভাগের চারি ভাগ দুষ্কর্ম্ম প্রায় সুরাপানদোষ-হইতেই উৎপন্ন হয়। আর একজন লেখক বলেন যে, যদি সুরা না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক পাপ, অধিকাংশ দরিদ্রতা এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ দূরীভূত হইত।

পরীক্ষাদ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ২১ একবিংশ হইতে ৩০ ত্রিংশত্তম বৎসরপর্য্যন্ত বয়ঃক্রমে মিতাচারি-অপেক্ষা সুরাপায়িদিগের মৃত্যু পাঁচ গুণ অধিকতর; এবং ৩০ ত্রিংশ হইতে ৪০ চত্বারিংশ বর্ষপর্য্যন্ত চতুর্গুণ অধিক হইয়া থাকে।

সুরায় আসক্ত হইলে, আয়ুর প্রায় হ্রাস হইয়া থাকে।

মিতাচারী	২০	বৎসর বয়ঃক্রমে সম্ভবতঃ	আর ৪৪	বৎসর বাঁচিতে পারে।
,,	৩০	,,	৩০	,,
,,	৫০	,,	২১	,,
,,	৬০	,,	১৪	,,
সুরাপায়ী	২০	বৎসর বয়ঃক্রমে সম্ভবতঃ	আর ১৫	বৎসর বাঁচিতে পারে।
,,	৩০	,,	১৩	,,

সুরাপায়ী	৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে	সম্ভবতঃ আর	১১	বৎসর	বাঁচিতে পারে।
„	৫০	„	১০	„	
„	৬০	„	৮	„	

সুরাসক্ত হইবার পর, কৃষী ও শ্রমজীবী ব্যক্তিগণ সচরাচর প্রায় ১৮ বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না; দোকানদার, পাইকের, বণিগবৃত্ত্যবলম্বী ও সওদাগরেরা ১৭ বৎসর; ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোকেরা ১৫ বৎসর এবং স্ত্রীলোকেরা ১৪ বৎসর।

সুরার সহিত স্বাস্থ্যের কোন সম্পর্ক নাই, বরং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন যে, মানবশরীরের পক্ষে সুরা একটি বিষের স্বরূপ। অল্প পরিমাণে পান করিলে, উহার কোন বিশেষ হানিজনক ফল তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ক্রমশঃ অধিক দিন, অল্প পরিমাণে পান কবিলেও, উহা ক্রমে শরীরকে রোগগ্রস্ত করিয়া ফেলে। সুরা পান করিলে যে রক্তের তেজ হয়, শরীর সবল করে, রোগ ও শোক দূর হয়, শ্রমশীল ও কর্ম্মক্ষম হওয়া যায়,—এ সকল সাধারণ ভ্রম মাত্র। এই নিমিত্ত সুরা এককালে পরিত্যক্ত করাই বিধেয়। তবে পীড়াবস্থায় বিচক্ষণ চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ঔষধার্থে সেবন করা যাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়।

বায়ু।

বায়ু আমাদের জীবনের পক্ষে একটি নিতান্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। ইহাদ্বারা নিঃশ্বাসকার্য্য সম্পন্ন হয়।

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রথমেই আমরা নিঃশ্বাসদ্বারা বায়ু গ্রহণ করি, এবং মৃত্যুকালে প্রশ্বাসদ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করাই দেহের শেষ কার্য্য। আহারাভাবে আমরা বরং কিছু দিন জীবিত থাকিতে পারি, কিন্তু বায়ু অভাবে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইলে, আমরা এক দণ্ডও বাঁচিতে পারি না। এই নিমিত্ত বায়ু পৃথিবীর সকল স্থানেই এত প্রচুর পরিমাণে ব্যাপ্ত আছে যে, স্বভাবতঃ জীবমাত্রকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও উহার অভাব ভোগ করিতে হয় না। বায়ু পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রায় ৪৫ মাইল (২২॥ ক্রোশ) পরিমিত ঊর্দ্ধদেশ পরিবেষ্টিত করিয়া আছে। বায়ু আমরা দেখিতে পাই না, এবং গতি না হইলে উহাকে আমরা বোধ করিতেও পারি না। কিন্তু মৎস্য যেরূপ জলের মধ্যে বাস করে, আমরাও সেইরূপ ভূ-বায়ুর মধ্যে বাস করিয়া থাকি। বায়ু গতিপ্রাপ্ত হইলেই উহাকে ঝড় বলে।

বায়ুর মৌলিকতা।—ভূ-বায়ু অম্লজান, যবক্ষারজান, অঙ্গারক এবং জলীয় প্রভৃতি বাষ্পের সমষ্টিমাত্র। ইহার মধ্যে অম্লজান ও যবক্ষারজান বাষ্পের ভাগই অধিক। অম্লজান ১ ভাগ এবং যবক্ষারজান ৪ ভাগ। বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রায় ৭৯ ভাগ যবক্ষারজান বাষ্প এবং ২১ ভাগ অম্লজান বাষ্প আছে; এবং অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ অত্যন্ত অল্প; ১০০০০ ভাগে ৪ ভাগ মাত্র।

অম্লজানবাষ্প। এই কতিপয় বাষ্পের মধ্যে অম্লজানই বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা অতিশয় তেজস্কর এবং জ্বলনীয়, অর্থাৎ অগ্নির সহিত স্পৃষ্ট হইলেই জ্বলিয়া উঠে। ইহা প্রাণিজীবন ও অগ্নিদাহের এক মাত্র কারণ। বায়ুতে যদি অম্লজান বাষ্প না থাকিত,

তাহা হইলে প্রাণিমাত্রেই জীবিত থাকিতে পারিত না, এবং অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত। ইহা যে প্রাণিজীবন ও অগ্নির পক্ষে কত আবশ্যকীয়, তাহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দুইটি কাচের ফানস লইয়া,—প্রথমটির মধ্যে যদি একটি জীবিত ক্ষুদ্র পক্ষী এবং অন্যটির মধ্যে একটী জ্বলন্ত বাতী এরূপ দৃঢ় ভাবে ক্ষণকাল আচ্ছাদিত করিয়া রাখা যায়, যাহাতে বহি-র্দ্দেশের বায়ু উহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রথম ফানসস্থিত বায়ুতে যে অত্যল্প অম্লজান বাষ্পের ভাগ আছে, তাহা অল্পক্ষণ মধ্যে পক্ষির নিঃশ্বাস কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যায় এবং পক্ষীও অম্লজান বাষ্পের অভাবে এবং প্রশ্বা-সিত অঙ্গারক বাষ্পের দোষে শীঘ্র প্রাণত্যাগ করে। এবং ঐরূপে দ্বিতীয় ফানসস্থিত বায়ুর অম্লজান বাষ্পের ভাগ শীঘ্র বাতীদ্বারা পুড়িয়া যায়, এবং অম্লজান বাষ্পের অভাবে বাতী শীঘ্র নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বহির্দ্দেশস্থ বায়ু যদি অল্প পরিমাণে ফানসের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে পক্ষিটি শীঘ্র না মরিয়া নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, এবং বাতীটীও এককালে নির্ব্বাপিত না হইয়া, মিট্ মিট্ করিয়া অতি ক্ষীণ আকারে জ্বলিতে থাকিবে।

বায়ুতে অম্লজান বাষ্পের সহিত যবক্ষারজান বাষ্প যদি মিলিত না থাকিত, তাহা হইলে উহা এত তেজস্কর হইত যে, নিঃশ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া জীব মরিয়া যাইত,

এই হেতু অম্লজান বাষ্পের তেজ হ্রাস করিবার নিমিত্ত উহার এক ভাগের সহিত চারি ভাগ নিস্তেজ যবক্ষারজান বাষ্প মিশ্রিত হইয়া বায়ু প্রস্তুত হইয়াছে।

অঙ্গারক বাষ্প। বায়ুর এই দুইটি প্রধান উপাদান অম্লজান ও যবক্ষারজান বাষ্প-ব্যতিরেকে কতিপয় প্রকার অন্য দূষিত বাষ্প বায়ুর সহিত মিলিত থাকিয়া উহাকে অনিষ্টকর করে। এই দূষিত বাষ্পসমূহের মধ্যে অঙ্গারক বাষ্পই সর্ব্বপ্রধান। ইহা পৃথিবীর সকল স্থানের বায়ুর সহিত সতত সামান্য পরিমাণে মিলিত থাকে। বায়ুর দশ সহস্র ভাগের চারি ভাগ অঙ্গারক বাষ্প। কিন্তু নগরের বায়ুতে ইহার ভাগ অধিক হইয়া থাকে।

অঙ্গারক বাষ্পের উৎপত্তি। এই অপকারক অঙ্গারক বাষ্প প্রাণিদিগের শরীরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অম্লজান বাষ্পের সহিত অঙ্গার মিশ্রিত হইয়া অঙ্গারক বাষ্প প্রস্তুত হয়। নিঃশ্বাসদ্বারা বায়ু শরীরমধ্যে গৃহীত হইলে, উহার অম্লজান ভাগ ফুস্‌ফুস্‌-দ্বারা রক্তের সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং কৃষ্ণবর্ণ ও অপরিস্কৃত রক্ত বিশোধিত হইয়া উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ হয়। অধিকন্তু এই অম্লজান বায়ু রক্তের সহিত সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হইয়া শরীরের পরিত্যক্ত পদার্থের অঙ্গারভাগের সহিত মিলিত হইয়া, ইহাকে দাহন করিয়া ফেলে। এই অঙ্গারের দাহনহইতেই অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়; এবং ইহাহইতেই শারীরিক তাপ উদ্ভাবিত হয়। এইরূপে একজন

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরমধ্যে প্রায় ৬৩৬ গ্রেন্ বা ৩।০ ভরি ওজনের অঙ্গারক বাষ্প এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয় এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেবল প্রশ্বাসদ্বারা ১২ হইতে ১৬ ঘনফুট (cubic feet) পরিমাণ এই বাষ্প শরীরহইতে নির্গত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সচরাচর বায়ুর দশ সহস্র ভাগে চারি ভাগ অঙ্গারক বাষ্প আছে; কিন্তু প্রশ্বাসদ্বারা যে বায়ু শরীরহইতে নির্গত হয়, তাহাতে এই বাষ্পের ভাগ ১০০ একশতগুণ অধিক, অর্থাৎ দশ সহস্র ভাগে চারিশত ভাগ আছে। নিঃশ্বাসব্যতীত গাত্রের ত্বক্‌হইতেও এই বাষ্প অধিকতর পরিমাণে নির্গত হয়।

কয়লা, কাষ্ঠ, তৈল-প্রভৃতি অঙ্গারক দ্রব্যের দাহনহইতেও অঙ্গারক বাষ্প অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অম্লজান বাষ্পভিন্ন দাহনকার্য্য হয় না। এই দাহনের ফল অঙ্গারক বাষ্প।

উদ্ভিজ্জদ্বারা এই বাষ্প কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রাণিদিগের ন্যায় উদ্ভিজ্জেরও নিঃশ্বাসক্রিয়া আছে। বৃক্ষ লতাদি পত্রদ্বারা দিবসে অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করে এবং অম্লজান বাষ্প ত্যাগ করে, কিন্তু রাত্রিকালে এবং ফুল ফুটিবার সময় অঙ্গারক বাষ্প ত্যাগ করে।

মৃতজীবদেহ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি পচিয়াও অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই সকল দ্রব্য শীঘ্র পচিতে আরম্ভ হয় এবং অধিক দূষিত বাষ্প নির্গত হয়। শরীরের দূষিত পরিত্যক্ত পদার্থ, ঘর্ম্ম, মল, মূত্র ইত্যাদি হইতেও এই বাষ্প উৎপন্ন হয়। সমাধিস্থান এবং আর্দ্র ও জলাকীর্ণ ভূমির বায়ুতে এই বাষ্প অধিক পরিমাণে থাকে।

অঙ্গারক বাষ্প একটি প্রাণনাশক বিষস্বরূপ। অম্লজান বাষ্প যাদৃশ জীবনের ও জ্বলনশক্তির আধার, অঙ্গারক বাষ্প উভয়েরই তাদৃশ বিনাশক। অঙ্গারক বাষ্পপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জীব বদ্ধ করিয়া রাখিলে, উহা তৎক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ করে, এবং ঐরূপে একটী জ্বলন্ত বাতী উহার মধ্যে রাখিলে, বাতীও নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। কখন কখন এই বাষ্প গভীর কূপের তলায় সঞ্চিত হইয়া থাকে। অসাবধানতাবশতঃ কেহ উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহার প্রাণের হানি হইয়া থাকে। এই রূপ কূপের মধ্যে জ্বলন্তবাতী প্রবেশ করাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

কোন সঙ্কীর্ণ গৃহে যদি বহুসংখ্যক লোক সমাগত হয় এবং সেই গৃহে কতকগুলি বাতী জ্বলিতে থাকে, তাহা হইলে প্রশ্বাসিত বায়ু ও অঙ্গার-দাহন-হইতে এত অধিক অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া উঠে যে, পুনঃ পুনঃ সেই দূষিত বাষ্প গ্রহণ করিয়া সকলেরই নানাবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়, এবং সকলেই সেই গৃহ শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। এতাদৃশ অবস্থায় গৃহহইতে বহির্গত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলেই, সে সকল ক্লেশ দূর হইয়া যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়া নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা-কর্ত্তৃক ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অন্ধকূপে যে শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অবগত হওয়া যায়, তাহা এই প্রশ্বাসিত অঙ্গারক বাষ্পদ্বারা ঘটিয়াছিল। ১২ দ্বাদশ বর্গহস্ত-পরিমিত একটি অতীব সঙ্কীর্ণ গৃহে রাত্রি আট ঘটিকার সময় ১৪৬ একশত ষট্চত্বা-

ত্রিংশৎ জন ইংরাজকে বলপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাতে অতি অল্পকাল-মধ্যেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া এবং বিশুদ্ধ বায়ু-অভাবে সংপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়া তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিরই প্রাণবিয়োগ হয়। রাত্রিপ্রভাতের পূর্ব্বেই ১২৩ একশত ত্রয়োবিংশতি জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তিদিগের প্রশ্বাসিত অঙ্গারক বাষ্পই তাহাদিগের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।

শয়নগৃহের সকল বাতায়ন ও দ্বার বিশেষরূপে বন্ধ করিয়া এবং উহার মধ্যে অঙ্গার প্রজ্বলিত করিয়া, রাত্রিকালে নিদ্রা যাইলে, প্রশ্বাস ও দাহনদ্বারা যে অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া ঘরের মধ্যে সঞ্চিত হয়, তাহার নিঃশ্বাস-গ্রহণে প্রাণের হানি হইতে পারে। এইরূপ ঘটনায় নিদ্রিত ব্যক্তির মৃত্যু হইতে শ্রবণ করা গিয়াছে।

কেহ বলিতে পারেন যে, এত সামান্ত পরিমাণে অঙ্গারক বাষ্প নিঃশ্বাস-দ্বারা গ্রহণ করিলে যদি মনুষ্যের মৃত্যু হয়, তবে ভূমণ্ডলের অগণ্য মানব ও ইতর প্রাণির প্রশ্বাস-হইতে এবং পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের অগ্নিদাহন-হইতে যে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গারক বাষ্প নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদ্বারা অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত জীব নষ্ট হইয়া যাইতে পারিত। তাহা সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃতির এইরূপ আশ্চর্য্য নিয়ম যে, যে অঙ্গারক বাষ্প জীবগণ প্রশ্বাস-দ্বারা পরিত্যাগ করে, তাহাই আবার উদ্ভিজ্জেরা আহার বলিয়া গ্রহণ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবের ন্যায় উদ্ভিজ্জেরও নিঃশ্বাসক্রিয়া আছে। জীবগণ

বায়ুর অম্লজান বাষ্প শরীরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, অঙ্গারক বাষ্প ত্যাগ করে; কিন্তু উদ্ভিজ্জেরা অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করিয়া, উহার অম্লজানভাগ ত্যাগ করে। এবং যে পরিমাণে অম্লজান বাষ্প জীবের কার্য্যেপ্রযোজিত হয়, ঠিক্ সেই পরিমাণেই উহা উদ্ভিজ্জহইতে উৎপন্ন হইয়া, বায়ুর প্রকৃত বিশুদ্ধাবস্থা নিয়ত রক্ষিত করে। জীবগণ যেরূপ রাত্রি ও দিবস, সকল সময়েই অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিয়া অঙ্গারক বাষ্প পরিত্যাগ করে, উদ্ভিজ্জ-সকল সেরূপ করে না। দিবসে এবং রৌদ্রের দীপ্তিতে উদ্ভিজ্জের পত্রসমূহ অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করে, এবং অম্লজান বাষ্প ত্যাগ করে, কিন্তু রাত্রিকালে অঙ্গারক বাষ্পের শোষণ বন্ধ করিয়া, পূর্ব্বগৃহীত অঙ্গারক বাষ্প কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিত্যাগ করে। এই নিমিত্ত রাত্রিকালে শয়নঘরের নিকটে বা মধ্যে বৃক্ষ-লতাদি রাখা যুক্তিসিদ্ধ নয়, কিন্তু দিবসে ইহারা বাটীর মধ্যে বা নিকটে থাকিয়া বায়ুর অঙ্গারকভাগ গ্রহণপূর্ব্বক উহাকে পরিষ্কৃত করে। যাঁহারা ফুলগাছ ভালবাসেন, তাঁহারা দিবসে উহা গৃহের অভ্যন্তরে রাখিতে পারেন, কিন্তু রজনীযোগে স্থানান্তরিত করিতে কদাচ অবহেলা প্রকাশ না করেন।

অঙ্গারক বাষ্পের ন্যায় আর একটি অতিশয় অনিষ্টকর বাষ্প বায়ুকে অনুক্ষণ দূষিত করে। ইহার নাম গন্ধক-উদজান-বাষ্প (Sulphoretted-hydrogen)। মৃতজীব ও গন্ধক-সংযুক্ত-উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়া যে সকল দূষিত বাষ্প উত্থিত হয়, তাহার মধ্যে এই বাষ্পটি সর্ব্বপ্রধান। ইহা সচরাচর পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালী, গর্ত্ত বা পুষ্করিণী-হইতে অধিক পরিমাণে উত্থিত

হয়। ইহাও অঙ্গারক বাষ্পের ন্যায় প্রাণনাশক, কিন্তু উহার ন্যায় গন্ধশূন্য নহে। নিঃশ্বাসদ্বারা এই বাষ্প অধিক পরিমাণে শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, জীবের প্রাণ বিয়োগ হয় এবং অল্প পরিমাণে হইলে, শিরঃপীড়া, বমন, উদরাময় প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

বাসগৃহ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব অপরিষ্কৃত রাখিলে, তথা-হইতে নানাপ্রকার অনিষ্টকারী বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুকে দূষিত করে এবং ঐ বায়ু সেবনে স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। আমাদের দেশের সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহাদের বাসগৃহ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব যেরূপ অপরিষ্কৃত ও জঘন্য অবস্থায় রাখিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রায় সকলেই তাহাদের বাটীর মধ্যে বা বহির্ভাগে স্থানে স্থানে বহুবিধ আবর্জ্জনা জঞ্জাল আদি পরিত্যক্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া, সেই সকল স্থান নিতান্ত জঘন্য অবস্থায় রাখে। এই সকল স্থানকে চলিত কথায় 'আঁস্তাকুড়' বলে। অনেকের গোগৃহ, অশ্বশালা প্রভৃতি দুর্গন্ধময় স্থানসকল প্রায় বাসগৃহের মধ্যে বা সন্নিকটেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে তাহাদিগের বাটীর চতুষ্পার্শ্ব পূতিগন্ধযুক্ত জলনালীদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখে। এই সমস্ত অপরিষ্কৃত স্থান-হইতে যে সকল দুর্গন্ধময় ও অনিষ্টকারী বাষ্প উদ্ভূত হয়, তাহা গৃহের বায়ুকে দূষিত করিয়া আমাদের জীবনের পক্ষে বিশেষ হানিজনক হয়। অতএব আমাদের বাসগৃহের অভ্যন্তরের ও চতুষ্পার্শ্বের বায়ু সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপযুক্ত পয়োনালী দ্বারা বাটীর জল যাহাতে উত্তমরূপে বহি-

র্গত হয়, এরূপ করা আবশ্যক; উচ্ছিষ্ট বা অন্যান্য পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি বাটী-হইতে স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত করা বিধেয়। আঁস্তাকুড় ও জঙ্গল প্রভৃতি অপরিষ্কৃত স্থান সকল সর্ব্বদা পরিষ্কৃত করা বিহিত; এবং গোগৃহ, অশ্বশালা ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু বা পক্ষি-দিগের বাসস্থান বাটীর মধ্যে বা সন্নিকটে রাখা উপযুক্ত নহে। বাটীর মধ্যে বা সমীপে পঙ্কবিশিষ্ট দুর্গন্ধময় পুষ্করিণী বা কূপ থাকিলে, উহা পুনর্ব্বার খনন, পঙ্কোদ্ধার বা ভরাট করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সকল নিয়ম-অনুসারে কার্য্য করিতে অবহেলা করিলে, আমাদের বাসস্থান নানাপ্রকার পীড়ার আকর হইয়া উঠে। কোন এক বাটীর বায়ু দূষিত হইলে যে, কেবল সেই বাটীর লোকেরাই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে এমত নহে, ঐ বাটীর দূষিত বায়ু নানাস্থানে পরিচালিত হইয়া অন্যান্য বাটীর লোক-দিগকেও পীড়িত করিতে পারে। কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্বর, ওলাউঠা (বিসূচিকা) প্রভৃতি কতিপয়-প্রকার সংক্রামক রোগ আছে, যাহা অন্যত্রের দূষিত বায়ুর সঞ্চালনদ্বারা উৎপাদিত হয় এবং তাহার উপর আমাদিগের বিশেষ ক্ষমতা নাই। কিন্তু অপরিষ্কৃতস্থানে যে এই সকল রোগ অধিক সাংঘাতিক হইয়া থাকে, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। দূষিত বায়ু নিঃশ্বাসদ্বারা শরীরমধ্যে গ্রহণ করিলে, অক্ষুধা, অজীর্ণতা, অস্বচ্ছন্দতা, শারীরিক ও মানসিক ক্ষীণতা প্রভৃতি রোগে প্রায় আক্রান্ত হইতে হয়।

ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে জীর্ণ হইয়া, ফুস্‌ফুসের অম্লজান বাষ্পের সহিত সংলগ্ন না হইলে, বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয় না, এই

নিমিত্ত বায়ু ও ভুক্তদ্রব্যের ভাগ সমতুল্য হওয়া আবশ্যকীয়। নির্ম্মল বায়ু সেবনে বঞ্চিত নগরবাসিগণ এবং অধিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম, অথবা অলস বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ প্রায় অল্পাহারী হইয়া থাকে, এই জন্যই তাহারা ভুক্তদ্রব্যহইতে যথেষ্ট ফললাভ করিতে পারে না। কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকেরা অপেক্ষা-কৃত নির্ম্মল বায়ু সেবন করে এবং শারীরিক পরিশ্রম-দ্বারা অধিক নির্ম্মল বায়ু শরীরমধ্যে গ্রহণ করে; এই নিমিত্তই তাহাদের আহার যেমন অধিক, শরীরও তেমনি সুস্থ। ফুস্‌-ফুসের রোগ-জন্য বা বায়ুর দোষ-জন্য অম্লজান বাষ্পের পরিমাণ অল্প হইলে, শরীরের অবশ্য-পরিত্যাক্ত দ্রব্য-সকল নির্গত না হইয়া, অধিকাংশই শরীরমধ্যে রহিয়া যায়। এই কারণে অক্ষুধা, বমনেচ্ছা, অজীর্ণদোষ ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও শারীরিক পরিশ্রম করিলে, আমা-দিগের শরীর পুষ্ট হয় এবং অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়; তাহাতেই আমরা সকল কর্ম্ম স্ফূর্ত্তির সহিত নির্ব্বাহিত করিতে সক্ষম হই। কিন্তু যাহারা বায়ু-বদ্ধ গৃহে এবং দূষিত বাষ্পপূরিত স্থানে বাস করে, তাহারা প্রায় নিস্তেজ ও হীনবল হইয়া থাকে এবং কোন কর্ম্মই উৎসাহ-সহকারে সম্পন্ন করিতে পারে না। এই সকল লোক বল-ও-উৎসাহহীন হইয়া প্রায় মাদকদ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে তাহাদের শরীর ও মন ক্ষণেক উত্তেজিত হইতে পারে, কিন্তু মাদকতা দূর হইলেই তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের এবং সেই সকল দেশের ভিন্ন ভিন্ন

স্থানের পীড়া ও মৃত্যুসংখ্যা পরীক্ষা করিলে জানিতে পারা যায় যে, উহা সকল স্থানে সমান নহে। পল্লিগ্রাম-অপেক্ষা নগরের বায়ু অনেকতর পরিমাণে নিকৃষ্ট, এই নিমিত্ত নগরের পীড়া ও মৃত্যুসংখ্যা পল্লীগ্রাম-অপেক্ষা অনেকতর পরিমাণে অধিক। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লণ্ডন প্রভৃতি মহানগরের লোকের মৃত্যুসংখ্যা প্রতি সহস্রে প্রায় ২৫ হইতে ৩৫ জনপর্য্যন্ত; কিন্তু উত্তম পল্লীগ্রামের মৃত্যুসংখ্যা প্রতি সহস্রে ১৭ জনের অধিক নহে; অর্থাৎ পল্লীগ্রাম-অপেক্ষা নগরের মৃত্যুসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণতর। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অধিক-জনতা, বহুসংখ্যক সংকীর্ণ বাসগৃহ, অনিষ্টকর বাষ্পরাশি ইত্যাদি নানাবিধ কারণ-পরবশে নগরের বায়ু অনেক সময়ে দূষিত পদার্থের সহিত মিলিত থাকিয়া নানাপ্রকার পীড়ার কারণ হয় ও মৃত্যুসংখ্যাবৃদ্ধি করে।

বায়ু-সঞ্চালন।—বায়ু নানা সূত্রে সতত দূষিত হইয়া থাকে। যদ্যপি সর্ব্বদা শোধিত ও পরিচালিত না হইত, তাহা হইলে অতি অল্পকাল-মধ্যেই উহা জীবনকার্য্যের অযোগ্য হইয়া পড়িত। যে কয়েকটি প্রাকৃতিক আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে বায়ু সতত সঞ্চালিত ও পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

১। পরিব্যাপকতা। এই নিয়মটি বায়ু-সঞ্চালনের এক প্রধান উপায়। ইহা-দ্বারা দুইটি বাষ্প একত্রিত হইলে, একটি অপরটীর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। লঘু বা গুরু, নির্ম্মল বা বিষময়, স্নিগ্ধ বা উষ্ণ, সকল প্রকার বাষ্পই একত্রিত হইলে, পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে দূষিত-অনিষ্টকর

বাষ্পসমূহ পরিব্যাপ্ত হইয়া, বিশুদ্ধ বায়ুরাশির সহিত অনায়াসে মিলিত হয়। এইরূপেই দূষিত বাষ্পের তেজ হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। এবম্বিধ হিতকর নিয়ম না থাকিলে, স্থানবিশেষের দূষিত বাষ্প রাশীকৃত হইয়া জীবননাশক হইয়া পড়িত। বায়ুর এই ব্যাপকতাশক্তি থাকাতে কোন দূষিত বাষ্প একস্থানে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া বিশেষরূপ হানিজনক হইতে পারে না।

২। উত্তাপ। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া, স্ব-স্ব-বিকীরণশক্তির পরিমাণ অনুসারে তাপ পরিত্যাগ করে। ঐ তাপ-হেতু চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু উত্তাপিত হইয়া প্রসারিত ও লঘু হয়। গুরুত্বের হ্রাস হইলেই বায়ু ক্রমশঃ উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে, এবং পার্শ্বস্থ বায়ু তৎক্ষণাৎ সঞ্চালিত হইয়া উহার স্থান অধিকার করে।

৩। বাত্যা। ইহা বায়ু-সঞ্চালনের আর একটি প্রধান উপায়। বায়ুর বেগানুসারে বায়ুস্থ দূষিত পদার্থসকল স্থানান্তরিত হয়। বায়ুর এইরূপ সঞ্চালন দ্বারা সকল স্থানের, বিশেষতঃ জন-পূর্ণ নগরের, দূষিত বায়ু বিশোধিত হইয়া থাকে।

৪। উদ্ভিদ্। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জেরা বায়ুর অঙ্গারক-বাষ্পকে অঙ্গার ও অম্লজান এই দুই ভাগে বিভক্ত করে। অঙ্গারভাগ আপনাদের পুষ্টির নিমিত্ত গ্রহণ করে এবং অম্লজান অংশ ত্যাগ করিয়া, বায়ুর সংশোধন-কার্য্যে সহায়তা করে।

৫। বৃষ্টি। বায়ুতে যে সকল বিশুদ্ধ পদার্থ ভাসমান থাকে,

তাহা বৃষ্টি দ্বারা ধৌত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। বজ্রপাতেও বায়ু সংশোধিত হয়।

এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম-দ্বারা বহির্দ্দেশের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বায়ু সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু বাসগৃহের মধ্যস্থিত বা সন্নিহিত অধিকতর দূষিত বায়ুর বিশোধনে ঐ সকল নিয়ম যথেষ্ট হইতে পারে না। এই নিমিত্ত আমাদিগকে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়; যথা, বায়ুসঞ্চালনযোগ্য গৃহ-নির্ম্মাণ, দুর্গন্ধ-নিবারক ও দূষিত-পদার্থ-শোধক দ্রব্য-ব্যবহার ইত্যাদি।

বাসগৃহে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যকীয়। অধিক লোকের নিঃশ্বাসকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া বায়ুর অম্লজান-ভাগের হ্রাস হইলে যত দোষের হয়, প্রশ্বাসিত অঙ্গারক-বাষ্প ও দেহহইতে পরিত্যক্ত অন্যান্য দূষিত পদার্থ বাষ্পাকারে অধিক পরিমাণে বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইলে, উহা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া পড়ে। জন-পূর্ণ ও বায়ু-রুদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিলে যে কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা বারম্বার-প্রশ্বাসিত দূষিত বায়ু শরীর-মধ্যে গ্রহণ-করাপ্রযুক্ত ঘটিয়া থাকে।

একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরহইতে প্রশ্বাস ও ত্বগ্দ্বারা এক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৯৬০ ঘন ইঞ্চ (cubic inches) পরিমিত অঙ্গারক বাষ্প, ৭॥ তোলা ওজনে জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ নির্গত হয়।

আমাদের প্রশ্বাসিত বায়ুতে যে অঙ্গারক বাষ্প আছে, তাহা

অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। একটী শিশীতে কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত চূণের জল রাখিয়া, তাহার মধ্যে ক্ষণকাল নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলে, ঐ জল ক্রমে আবিল ও দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া পড়ে। রাসায়নিক গুণপ্রযুক্ত চূর্ণ, অঙ্গারক বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, চা-খড়ি হয়। চা-খড়ি শুভ্র; এই নিমিত্ত প্রশ্বাসের অঙ্গারক বাষ্পদ্বারা চূণের জলে চা-খড়ি প্রস্তুত হইলেই উহা শাদা হইয়া পড়ে।

আমাদের প্রশ্বাসিত বায়ুর সহিত যে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়, তাহা সময়ে সময়ে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে প্রত্যূষে আমাদিগের মুখহইতে যে ধূমরাশি নির্গত হয়, তাহা জলীয় বাষ্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রীষ্মকালে ঐ ধূম দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু দর্পণে নিঃশ্বাস নিক্ষেপ করিলে, উহা জলীয় বাষ্পদ্বারা আবৃত হয়।

দূষিত পদার্থ, যাহা ত্বক্ ও প্রশ্বাসদ্বারা বহির্গত হয়, তাহা যদিও আমরা দেখিতে পাই না, তথাপি দুর্গন্ধ-প্রযুক্ত ঘ্রাণদ্বারা অনুভব করিতে পারা যায়।

বাসগৃহ প্রশস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গৃহে অন্ততঃ দুইটি প্রশস্ত সমান্তরাল বাতায়ন থাকা প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ একটী অন্যটির অপর দিকে থাকিবে। বায়ু এক গবাক্ষপথদিয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্গত হইবার নিমিত্ত অপরদিকে যদি রুদ্ধ জানালা না পায়, তাহা হইলে বায়ু-সঞ্চালন উত্তমরূপে সমাধা হয় না। গৃহ উচ্চ ও বিস্তৃত হইলে, উহার দেয়ালের উচ্চভাগ বা ছাদের দিক-হইতে বায়ু-সঞ্চালনের উপযুক্ত পথ

রাখা আবশ্যক কর্ত্তব্য। জন-পূর্ণ গৃহের দূষিত বায়ু প্রশ্বাসিত বাষ্প বা বাতীর আলোকদ্বারা উত্তপ্ত হইলে, প্রসারিত ও লঘু হইয়া ঊর্দ্ধদেশে, অর্থাৎ ছাদের দিকে,'ধাবমান হয়। এই নিমিত্ত দেয়ালের উচ্চভাগে বায়ু বহির্গমনের উপযুক্ত পথ না রাখিলে, সঞ্চালনকার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে না। গৃহের লঘু দূষিত বায়ু ঐ সকল উচ্চ গবাক্ষাভিমুখে গমন করিলে, উহার স্থানে নিম্নের দ্বার ও জানালাদ্বারা বহির্দ্দেশের নির্ম্মল বায়ু গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করে। শয়নগৃহের বায়ু-সঞ্চালন-বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। যে গৃহে আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় এবং সুখময় নিদ্রা-ভোগে শরীরের ক্লান্তি দূরীভূত হয়, সে স্থানের বায়ু যে অধিক নির্ম্মল রাখা আবশ্যকীয়, তাহা বলা বাহুল্য।

অনেকে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি বা অন্যান্য পীড়ার আশঙ্কায় শয়নগৃহের সমস্ত জানালা ও বায়ু গমনাগমনের পথ বিশেষরূপে বন্ধ করিয়া শয়ন করে। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। বায়ু-রুদ্ধ গৃহে তিন চারি জন একত্র নিদ্রা যাইলে, গৃহস্থিত বায়ুর অম্লযান-ভাগ তাহাদের নিঃশ্বাস-কার্য্যে শীঘ্র ব্যয়িত হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট বায়ু প্রশ্বাসিত ও ত্বক্-হইতে উদ্ভাবিত অনিষ্টকর বাষ্পসমূহের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দূষিত হইয়া পড়ে। ধাতুবিশেষে সমস্ত রাত্র জানালা খুলিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি ও অন্য প্রকার পীড়া উপস্থিত হইতে পারে; সে স্থলে গৃহের সকল জানালা বন্ধ না করিয়া, শয্যার নিকটবর্ত্তী জানালা মুদ্রিত করিয়া, অপরগুলি খুলিয়া রাখিলে, ক্ষতি হয় না। শীত ও

বর্ষাকালে শয়নগৃহের জানালা বন্ধ রাখা আবশ্যকীয়, তথাচ যাহাতে নিকটবর্ত্তী ঘরের মধ্য-দিয়া নির্ম্মল বায়ু শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য।

শিশুদিগের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত নির্ম্মল বায়ুর যে কত প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। বাটীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও বায়ুসঞ্চালন-যোগ্য গৃহটিতে শিশুদিগকে শয়ন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাতে শীতল বা প্রবল বায়ু শিশুদিগের গাত্রে লাগিতে না পায়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া বিধেয়। অসাবধানতা-প্রযুক্ত শিশুদিগের গাত্রে শীতল বায়ু লাগাইলে, উহারা সহজেই পীড়িত হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাসগৃহ।

বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, যাহাতে সূর্য্যকিরণ ও নির্ম্মল-বায়ু অবিচ্ছেদে গৃহমধ্যে গতিবিধি করিতে পারে, এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

এ প্রদেশের বাসস্থান প্রায় দুইটি স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—বহিঃ ও অন্তর।

সদর-মহল অর্থাৎ বহির্ব্বাটী, প্রায় রাজপথের ধারে নির্ম্মিত হয়, এবং অন্দর মহল বা ভিতরবাটী উক্ত বাটীর পশ্চাতে বা পার্শ্বে হইয়া থাকে।

এই উভয় বাটী প্রায় চক্‌বন্দী করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ মধ্যস্থানে প্রাঙ্গন এবং চতুর্দ্দিক গৃহে বেষ্টিত। এই নিমিত্ত এরূপ বাটীর সকল গৃহে তুল্য পরিমাণে বায়ু সঞ্চালিত হওয়া অসম্ভব। এদেশে দক্ষিণাগত বায়ুই অধিক স্বাস্থ্যকর ও সুখ-প্রদ; এই নিমিত্ত গৃহের দক্ষিণ দিক অনাবৃত রাখিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সমান্তরাল গবাক্ষ রাখিবার প্রথা প্রায় অবলোকিত হয়।

গৃহ-নির্ম্মাণসম্বন্ধে বুদ্ধিমতী ভারত-ললনাকুলভূষণা খনার বচনটি অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।--

"পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁস, উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে," বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে তিনি উপদেশ দেন; অর্থাৎ গৃহের পূর্ব্বদিকে হংস চরিবার উপযুক্ত স্থান, অর্থাৎ পুষ্করিণী রাখা উচিত; তাহাতে প্রাতঃকালের সূর্য্যকিরণে পুষ্করিণীর জল তাদৃশ উত্তপ্ত হইবে না, এবং গৃহও সর্ব্বদা শীতল থাকিবে, অথচ জলীয় বাষ্পদ্বারা তাদৃশ আর্দ্র হইবে না। পশ্চিমে বাঁশ, অর্থাৎ উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ বাটীর পশ্চিমে থাকিলে, অপরাহ্নের প্রখর সূর্য্যকিরণ উহাতে পতিত হইয়া গৃহকে তাদৃশ উত্তপ্ত করিতে পারিবে না, এবং বৃক্ষদ্বারা গৃহ প্রবল বাত্যাহইতে কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইতে পারিবে। উত্তরাগত বায়ু অতি অপকৃষ্ট এবং পীড়াদায়ক, এই নিমিত্ত গৃহের উত্তর দিক্ বেষ্টন করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিলে, ক্ষতি হয় না। দক্ষিণাগত বায়ু অধিকতর মনোহর ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া, উহার সমাগমের নিমিত্ত দক্ষিণ-দিকে কিয়ৎপরিমাণে ভূমি অনাচ্ছন্ন রাখিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ করা

কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অপরের বাটী-দ্বারা বায়ু রুদ্ধ হইতে পারিবে না।

বাটীর দক্ষিণদিকের গৃহগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দক্ষিণ ও উত্তর বা অপর দিকে ক্ষুদ্র জানালা থাকিলে, দক্ষিণাগত বায়ু-যথেষ্ট পরিমাণে গৃহমধ্যে গতায়াত করিতে পারে। এই নিমিত্ত চক্-বন্দী বাটীর দক্ষিণ-ব্যতীত অপর দিকের গৃহরাজী তত উৎকৃষ্ট হয় না। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদ্বারী গৃহের দক্ষিণদিকে জানালা না থাকিলেও তত মন্দ হয় না, কিন্তু উত্তরদিকের গৃহের দক্ষিণ-দিকে জানালা থাকা প্রয়োজনীয়, তাহা না হইলে বাসের উপ-যুক্ত হয় না। এই নিমিত্ত লোকে কথায় বলিয়া থাকে,—

"দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা,
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর কাছে না যাই"।

কথিত আছে, নবাবী আমলে উত্তরদ্বারী ঘরের কর ছিল না।

বাসগৃহ কেবল বায়ুসঞ্চালোপযোগী হইলেই যথেষ্ট হইবে না, গৃহটি শুষ্ক ও উন্নত স্থানে নির্ম্মিত করিতে হইবে। গৃহের মেজে ভূমিহইতে অন্ততঃ দুই হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যকীয়। গৃহ নিম্ন হইলে, আর্দ্র হইয়া পীড়াদায়ক হইতে পারে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দেশ-অপেক্ষা বঙ্গদেশ অধিকতর নিম্ন বলিয়া, এখানকার একতল গৃহের মেজে অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চ না হইলে, প্রায় ব্যবহারযোগ্য হয় না।

এদেশে সচরাচর দুইপ্রকার বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে,— ইষ্টক-নির্ম্মিত ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত।

পল্লীগ্রামে অধিকাংশ গৃহই মৃত্তিকানির্ম্মিত। এই সকল

ঘরের মেজে কোটাঘরের অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া প্রয়োজনীয়, এবং অনেক স্থলে তাহাই হইয়া থাকে। গৃহের মেজে উচ্চ হইলে উহা তত আর্দ্র হইতে পারে না। আর্দ্র মেজের উপর শয়ন করা অতিশয় নিষিদ্ধ। উহাতে শ্লেষ্মা, বাত প্রভৃতি জন্মাইতে পারে। নিতান্ত মেজের উপর শয়ন না করিয়া, অবস্থানুসারে পালঙ্ক, তক্তপোষ কিম্বা কেবল তক্তা বা দরমার উপর বিছানা করিয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য।

মেটেঘরের মেজে ও দেয়ালের কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত গোময় ও মাটী একত্র করিয়া প্রত্যহ লেপ দেওয়ার প্রথা মন্দ নহে। উহাতে দেয়াল ও মেজে ফাটিতে পায় না এবং নিম্নের আর্দ্রতা উপরে উঠিয়া ঘরের বায়ুকে আর্দ্র করিতে পারে না। গোময় ও মাটী দুর্গন্ধনাশক, এই নিমিত্ত উহার প্রলেপনদ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হয় এবং ঘর পরিস্কৃত ও শুষ্ক থাকে।

মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘরের দেয়ালের সহিত চালের সংযোগস্থানে চতুর্দ্দিকে যে ফাঁক থাকে, তাহার মধ্যদিয়া কিয়ৎপরিমাণে বায়ুসঞ্চালন হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত মেটেঘরের দেয়ালে কোটাঘরের ন্যায় অধিক অথবা বৃহৎ জানালা না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

মলত্যাগের স্থান গৃহহইতে কিঞ্চিৎ দূরে হওয়া আবশ্যক, এবং যাহাতে মল মাটীর সহিত সংলগ্ন না হইতে পারে ও প্রত্যহ স্থানান্তরিত করা হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের লোকেরা প্রায়ই গ্রামের প্রান্তরে যাইয়া মলত্যাগ করিত। ঐ মলের কতক অংশ শূকর প্রভৃতি জন্তুগণ ভক্ষণ

করিয়া ফেলিত এবং অবশিষ্টাংশ সাররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। এই নিমিত্ত উহা স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন হইত না। এক্ষণে সে পদ্ধতি নাই। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ গৃহে স্বতন্ত্র মলত্যাগের স্থান না থাকাতে, গ্রামবাসিরা গৃহের পিছনে, নিকটবর্ত্তী বাগানে, রাস্তার ধারে, মাঠে, পুষ্করিণীর পাড়ে অর্থাৎ সুবিধা ও ইচ্ছামত যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিয়া থাকে। এরূপ করায় যে কত অনিষ্ট হয় তাহা বলা বাহুল্য। ঐ সকল মল পচিয়া বায়ুকে দূষিত করে এবং বর্ষাতে কতক অংশ মাটির মধ্যে শোষিত হয়, এবং অধিকাংশ ধৌত হইয়া নদী ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে পতিত হইয়া পানীয় জলকে বিনষ্ট করে। পল্লীগ্রামের জল ও বায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা যে এত নিকৃষ্ট হইতে দেখা যায়, এবং ঐ সকল স্থানে জ্বরের যে এত প্রাদুর্ভাব, তাহার এই এক প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।

নগরে প্রায় প্রত্যেক গৃহে স্বতন্ত্র মলত্যাগের স্থান আছে এবং ঐরূপ পল্লীগ্রামেও হওয়া উচিত। মল যাহাতে মাটীর সহিত সংলগ্ন না হইতে পারে, এই নিমিত্ত মাটীর গামলা বা অন্য প্রকার পাত্রে উহা ধারণ করিয়া প্রত্যহ স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। গ্রামের প্রান্তভাগে স্থানে স্থানে গর্ত্ত খনন করিয়া, উহাতে সমস্ত মল নিক্ষেপ করিয়া মাটিচাপা দিয়া রাখিলে উহা পচিয়া সার হইবে এবং ঐ ভূমিতে চাষ করিলে ঐ সার কৃষিকার্য্যে বিশেষ ফলদায়ক হইবে। নগরে এরূপ সুবিধা না থাকায় অন্যপ্রকার উপায়দ্বারা মল স্থানান্তরিত করা হইয়া থাকে। লোকদ্বারা প্রত্যেক গৃহহইতে মল

উঠাইয়া স্থানে স্থানে জমা করিয়া পরে আবদ্ধ গাড়ীতে বোঝাই করিয়া কোন দূরান্তর বিল বা প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত করা হয়। কোন কোন নগরে মল এইরূপে মনুষ্যদ্বারা বাহিত না হইয়া, নলের দ্বারা চালিত হইয়া স্থানান্তরিত করা হইয়া থাকে।

মাটীর নিম্নভাগে প্রোথিত বহুসংখ্যক সরু নলের সংযোগে গৃহহইতে মল চালিত হইয়া অপেক্ষাকৃত মোটানলে পতিত হইয়া, অবশেষে কোন দূরান্তর বিলে নিক্ষিপ্ত হয়। সেখানে ঐ মলরাশি সার হইয়া কৃষিকার্য্যে ব্যয়িত হয়। সম্প্রতি এইরূপ নলদ্বারা বাহিত হইয়া কলিকাতানগরের মল ধাপা নামক বিলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই উপায়টি বহুল ব্যায়সাধ্য এবং রীতিমত কার্য্যকারক হইবার নিমিত্ত অধিক জলের আবশ্যক করে। সকলস্থানে এরূপ নলের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে এবং কলিকাতা নগরেও উহা এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই।

সূতিকাগার। যে ঘরে নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রায় একমাসপর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, সে ঘরটি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত, শুষ্ক ও বায়ুসঞ্চালনযোগ্য হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সংস্কার-দোষে আমাদের দেশে আতুঁড়ঘর ঠিক উহার বিপরীত হইয়া থাকে। নির্ম্মল বায়ু যাহাতে সূতিকাঘরে যাতায়াত করিতে পারে, অথচ প্রবল বা শীতলবায়ু শিশুর গাত্রে লাগিয়া উহাকে পীড়িত না করে, এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য।

বাসগৃহ পরস্পরের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। যাহাতে বায়ুসঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয় এবং রৌদ্র রীতিমত

লাগিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য।

বাসগৃহের সংস্করণের যেরূপ আবশ্যকতা, যে গ্রামে বাস করা যায়, তাহারও সংস্করণ বিষয়ে গ্রামবাসিমাত্রেরই সেইরূপ মনোযোগ প্রয়োজনীয়। গ্রামের মধ্যে বহুবধি প্রশস্ত রাজপথ, স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ কুসুমোদ্যান এবং উত্তম উত্তম সরোবর রাখা আবশ্যক। জলনীকাশের উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী চতুর্দ্দিকে থাকিবে এবং তাহা পরিষ্কৃত অবস্থায় রাখিতে হইবে। ইউরোপের প্রায় সকল নগরে মৃত্তিকার নিম্নে বহুসংখ্যক নল বসাইয়া জল ও অন্যান্য দূষিত পদার্থের নীকাশের উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতা নগরেও ঐরূপ জলনীকাশের নিমিত্ত নলের সৃষ্টি অনেক স্থানে হইয়াছে।

যেথানে এরূপ নলদ্বারা জলনীকাশের সুবিধা নাই, সেথানে সাধারণ নর্দ্দামাদ্বারা যাহাতে সকল জল কোন নদী বা বিলে পতিত হয়, এরূপ উপায় করা কর্ত্তব্য। গ্রামের নিকট নদী না থাকিলে, উত্তম পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা বা কূপ খনন করা কর্ত্তব্য, কিম্বা নদীর জল মন্দ হইলে, উহা পরিষ্কৃত করিবার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। পঙ্কিল পূতিগন্ধবিশিষ্ট পুষ্করিণী, গর্ত্ত বা কূপ গ্রামের মধ্যে বা নিকটে থাকিলে, তাহা পুনরায় খনন করা বা মাটীদ্বারা বুজান কর্ত্তব্য। যথেষ্ট মাটীর অভাব হইলে, রাস্তার জঞ্জালদ্বারা ভরাট করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অগ্রে পুষ্করিণীর জল শুষ্ক করিতে হইবে, পরে রাস্তার জঞ্জালদ্বারা ভরাট করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে উত্তম মাটী-দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিতে হইবে, তাহা হইলে ঐ সকল জঞ্জাল পচিয়া

বিশেষ কোন দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতে পারিবে না। এই জঞ্জালের সহিত মৃত জীবদেহ বা বিষ্ঠা থাকা, উচিত নহে। গ্রামের মধ্যে জঙ্গল রাখা কর্ত্তব্য নহে। বৃহদ্বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নশাখাসকল কর্ত্তন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহাদি-হইতে যে সকল জঞ্জালরাশি রাস্তা-পথে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা প্রত্যহ গ্রামের প্রান্তভাগে বা দূর-প্রান্তরে স্থানান্তরিত করিয়া মাটীদ্বারা আচ্ছাদিত বা দাহন করা কর্ত্তব্য। পুরীষরাশি ও মৃত জীবদেহ গ্রামহইতে অধিক দূরে নিক্ষেপ করা উচিত এবং উহা মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত বা দাহন করা কর্ত্তব্য। নদী বা পুষ্করিণীর অনতি নিকটে পুরীষাদি নিক্ষেপ করিলে, উহার জল বিদূষিত হইবে। শবদাহ করিবার স্বতন্ত্র স্থান গ্রামের বাহিরে বা কোন নদীর ধারে হওয়া আবশ্যক এবং সমাধিস্থানও ঐরূপ দূরে থাকা কর্ত্তব্য। মৃত্তিকার অন্ততঃ চারি ফিট্ নিম্নে শব প্রোথিত করিয়া উহার উপর যথেষ্ট পরিমাণে মাটী চাপা দেওয়া উচিত। গ্রামের মধ্যে চর্ম্ম প্রস্তুতকরণ, বসা গালিতকরণ প্রভৃতি দুর্গন্ধজনক অস্বাস্থ্যকর বৃত্তিসকল করিতে দেওয়া উচিত নয়। যদি গ্রামের নিকটে দূষিত জলাশয় বা বিল থাকে, এবং তাহার জলনীকাশ করা দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে উহাকে বেষ্টন করিয়া বৃক্ষরোপণ করিলে, উহার দূষিত বায়ুহইতে গ্রাম কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা হইতে পারিবে। এবম্বিধ নানারূপ স্বাস্থ্যকর উপায় অবলম্বন করিয়া, যাহাতে গ্রামটি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকে এবং জল ও বায়ু দূষিত না হইতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

বায়ুসঞ্চালনই গৃহের দূষিতবায়ু সংশোধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট

উপায়, তদ্ভিন্ন দুর্গন্ধনাশক ও দূষিত-পদার্থ-শোধক দ্রব্য ব্যবহার করিলেও বায়ু শোধিত হইতে পারে।

দুর্গন্ধনাশক দ্রব্য। ইহাদ্বারা বায়ুর কেবল দুর্গন্ধই নষ্ট হইয়া থাকে, অবিশুদ্ধতার কিছুই লাঘব হয় না। এই নিমিত্ত উহা-দ্বারা স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কোন বিশেষ উপকার না হইয়া বরং অপকার হইয়া থাকে। সকল অনিষ্টকর বাষ্পমাত্রেই গন্ধযুক্ত নহে, যথা অঙ্গারক বাষ্প প্রাণনাশক হইয়াও গন্ধশূন্য। অতএব দূষিত বাষ্প গন্ধশূন্য হইলেই যে বিশুদ্ধ হইবে, এরূপ নহে। অনেকে অপকারক বায়ুর দুর্গন্ধ দূরিত করিবার নিমিত্ত সুগন্ধ-দ্রব্য ব্যবহৃত করিয়া থাকেন, তাহাতে উহার দুর্গন্ধ দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু অপকারিতা নষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত বাটীর মধ্য বা বহির্দ্দেশ পরিষ্কৃত রাখিয়া যাহাতে দুর্গন্ধময় অনিষ্টকর বাষ্প জন্মিতে না পারে, এরূপ করাই শ্রেয়ঃ।

দূষিত-পদার্থ-শোধক দ্রব্য। যাহাদ্বারা বায়ুর দূষিত অংশ নষ্ট হয় বা উহা একেকালে জন্মাইতে না পারে, এরূপ পদার্থের মধ্যে কাষ্ঠের অঙ্গার সর্ব্বপ্রধান। মৃতজীব বা উদ্ভিদ্ পচিয়া যে সকল অনিষ্টকর বাষ্প উদ্ভূত হয়, কয়লা তাহা শোষণ করিয়া বায়ুকে বিশুদ্ধ করে। পীড়াগৃহে, বা দূষিত-বাষ্পপূর্ণ অন্যান্য স্থানে কয়লা ঝুড়ী করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে, ঐ সকল দূষিত বাষ্প কয়লা দ্বারা শোষিত হইয়া, বায়ুকে পরিষ্কৃত করে।

শুষ্ক-মৃত্তিকা ও ঘুঁটের ছাই বিষ্ঠার ও অন্যান্য দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

চূণের জল। অঙ্গারক বাষ্পের সহিত ইহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা

আছে; এই নিমিত্ত ইহাও পীড়াগৃহে ও অন্যান্য দুর্গন্ধময় স্থানে ব্যবহার করিলে, ঐ সকল স্থান পরিষ্কৃত হয়। চূণের জলদ্বারা গৃহের দেয়াল মধ্যে মধ্যে বিলেপিত করা কর্ত্তব্য।

লবণ। ইহাও একটি বায়ুর দূষিত-পদার্থ-শোধক দ্রব্য। অগ্নির উপরে কিঞ্চিৎ লবণ নিক্ষেপ করিলে যে ধূম নির্গত হয়, তাহাদ্বারা গৃহের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

আইডিন্ (Iodine) নামক দ্রব্যের বাষ্পও বায়ুর দূষিত অংশ শোধন্ করে। বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক পীড়া-গৃহে ইহার বাষ্প বিশেষ উপকারী।

দ্রাবকের সহিত সোরা বা তাম্র সংযোগে যে বাষ্প উত্থিত হয় (Nitrous acid) এবং গন্ধকের বাষ্প (Sulphurous acid), এই উভয় দ্রব্যই অতিশয় তেজস্কর গন্ধনাশক। এই নিমিত্ত উহাদ্বারা গৃহ পরিষ্কৃত করিতে হইলে, সে গৃহমধ্যে তৎকালে কাহারও থাকা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির উপর চূর্ণগন্ধক নিক্ষেপ করিলেই, গন্ধকবাষ্প নির্গত হয়।

কার্ব্বলিক্ আসিড্ (Carbolic acid) বায়ুশোধক একটি অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য। ইহার এক ভাগ, ৫০ বা ১০০ ভাগ উত্তপ্ত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষেপণ করিলে, অনিষ্টকর বাষ্পসকল নষ্ট হয়।

থাইমল (Thymol) নামক আর একটি অতি উৎকৃষ্ট বায়ু-শোধক দ্রব্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আজোয়ানের সারাংশ হইতে প্রস্তুত হয়।

সূর্য্যের আলোক বায়ুর ন্যায় আমাদের শরীরের পক্ষে

বিশেষ স্বাস্থ্যকর। গৃহের মধ্যে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকিয়া আলোক হইতে বঞ্চিত থাকিলে, শরীর রীতিমত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। উদ্ভিদ্ যেমন নিয়ত অন্ধকারময় স্থানে থাকিলে, উত্তমরূপে বৃদ্ধি হইতে পারে না, মনুষ্যশরীরও সেইরূপ অন্ধকারাবৃত স্থানে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকিলে, দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

সপ্তম অধ্যায়।

পরিচ্ছন্নতা।

পরিচ্ছন্নতা শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানের একটি প্রধান নিয়ম; ইহা অবহেলন করিলে শরীর রোগগ্রস্ত হইয়া নানাপ্রকার কষ্ট ভোগের আধার হয়। পরিচ্ছন্নতা-দ্বারা শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ থাকে এবং মন প্রফুল্ল হয়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, দেহ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন না থাকিলে, ধর্ম্মনিষ্ঠ বা ঈশ্বরোপাসনার যোগ্য হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য ধর্ম্মযাজকদিগকে সাধারণ লোক-অপেক্ষা অধিকতর পরিচ্ছন্ন-ভাবে থাকিতে প্রায় দেখা যায়।

প্রাতঃক্রিয়া। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া অল্প শীতলজলে একবার চক্ষুঃদ্বয় প্রক্ষালিত করা উচিত। ইহাতে নিদ্রার ঘোর ভঙ্গ হয় এবং নেত্রমলাজনিত দৃষ্টির অস্পষ্টতা দূর হয়।

জলশৌচ। অতঃপর মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া শীতল জলদ্বারা মলদ্বার-আদি উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিতে হইবে। বিশেষ-বেগদ্বারা বৃহৎ-অন্ত্র ও মলদ্বারের মাংসপেশী সঙ্কোচিত ও বর্দ্ধিত হইয়া মল নির্গত হয়। এই বেগের সহিত তৎকালে অধিক রক্ত মলদ্বারের দিকে ধাবমান হয় এবং ঐ রক্ত পুনরপসৃত না হইলেই একস্থানে নিয়ত প্রধাবিত হইয়া, অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগের সূত্রপাত করে। অতএব মলত্যাগের পর মলদ্বার ও উহার চতুস্পার্শ শীতল জলদ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য, তাহাতে ধাবিত রক্ত মলদ্বারহইতে স্থানান্তরিত হইয়া, ঐ স্থান সুস্থ করে। মৃত্তিকা বা অন্যপ্রকার গন্ধনাশক দ্রব্য-দ্বারা হস্তমার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তৎপরে দন্তধাবন, জিহ্বামর্দ্দন এবং মুখ, নাসা, নেত্রাদি উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

দন্তধাবন। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ বলিয়া, এখানে বৃদ্ধ হইবার পূর্ব্বহইতেই প্রায় অনেকেরই দন্ত পতন হইতে আরম্ভ হয়, এই নিমিত্ত এদেশের লোকদিগকে দন্তধাবন বিষয়ে প্রায় বিশেষ মনোযোগী ও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকে দাঁতন ব্যবহার করিয়া থাকে। বঙ্গদেশ-অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিম ও উড়িষ্যাদেশে ইহা অধিকতর প্রচলিত। কষায়, কটু বা তিক্তরসযুক্ত বৃক্ষের কোমল শাখার অগ্রভাগ অল্প পেষণ করিয়া দন্তঘর্ষণ করিবে; কিন্তু এরূপ সাবধানের সহিত করিতে হইবে, যাহাতে দন্তমূলস্থ মাংস অর্থাৎ মাড়ি আঘাত প্রাপ্ত না হয়। দাঁতনকাঠী কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় স্থূল, দ্বাদশাঙ্গুলী দীর্ঘ ও ত্বগ্‌যুক্ত হইবে। সচরাচর করবীর, আম্র,

করঞ্জ, বকুল, বিল্ব, নিম্ব, শাখোট, এরণ্ড, খর্জ্জুর ইত্যাদি বৃক্ষের প্রশাখা বা পল্লব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিক্তরসযুক্ত দন্ত-কাষ্ঠের মধ্যে নিম্বের প্রশাখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুবিধাবশতঃ নগর-অপেক্ষা পল্লীগ্রামে দাঁতনের ব্যবহার অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গুলীদ্বারা দন্তমার্জ্জনীয় দ্রব্য ঘর্ষণ করা, দন্ত পরিষ্কার করিবার অন্যতর উপায়। তামাকের গুলচূর্ণ, কয়লাচূর্ণ, ঘুঁটের ছাই, খড়ীচূর্ণ, মঞ্জন, মিসি লবণ ইত্যাদি নানাপ্রকার দন্তমার্জ্জনী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুল, কয়লা ও ঘুঁটের ছাই মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। খড়ীতে ময়লা অধিক পরিষ্কার করে। লবণদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে, লালা নির্গত হইয়া মুখের ক্লেদ শীঘ্র দূরীভূত হয়। লবণের সহিত কিঞ্চিৎ সর্ষপ তৈল মিশ্রিত করিয়া লইলে, আরও ভাল হয়। ইউরোপ-প্রভৃতি মহাদেশের লোকেরা অঙ্গুলীর পরিবর্ত্তে কঠিনলোম-যুক্ত বুরুশদ্বারা দন্তমার্জ্জন করিয়া থাকে এবং তাহা এক্ষণে আমাদের মধ্যেও অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে পরিষ্কার-কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারে, কিন্তু দৃঢ়রূপে ঘর্ষণ করিলে মাড়ির আঘাত হইবার সম্ভাবনা।

জিহ্বামার্জ্জন। দন্তধাবনের পর কোনপ্রকার জিহ্বানির্লে-খনদ্বারা জিহ্বার ক্লেদ সাবধানে পরিস্কৃত করা কর্ত্তব্য। জিহ্বা-নির্লেখনকে সচরাচর ‘জিবছোলা’ কহে। জিবছোলা প্রায় ধাতু বা বংশনির্ম্মিত হইয়া থাকে। জিবছোলার অভাবে দক্ষিণ হস্তের দুই বা তিনটী অঙ্গুলী মুখমধ্যে যুগপৎ প্রবিষ্ট করাইয়া জিহ্বার উপর সাবধানে ঘন ঘন সঞ্চালন করিলে, ও উপরপাটীর

দন্তদ্বারা জিহ্বামার্জ্জন করিলে, জিহ্বার ক্লেদ নির্গত হয় এবং জিহ্বার কোন আঘাত হয় না।

এইরূপে মূর্দ্ধা ও তালুদেশের ক্লেদও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা বহির্গত করিতে হয়। এই সময়ে নাসিকা ও কণ্ঠনালীর মধ্যে কফশ্লেষ্মাদি যাহা জমিয়া থাকে, তাহাও বহির্গত করা কর্ত্তব্য।

ঘর্ম্ম। চর্ম্মের নিম্নে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্র আছে; ইহারা দুইপ্রকার; একপ্রকারহইতে তৈলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইয়া কেশ ও চর্ম্মকে তৈলাক্ত করে এবং অন্যপ্রকারহইতে ঘর্ম্ম উদ্ভূত হয়।

লোমকূপ। ঘর্ম্ম-উৎপাদক যন্ত্রগুলি অতি ক্ষুদ্র এবং প্রত্যেকটিহইতে অতিসূক্ষ্ম নল চর্ম্মভেদ করিয়া বহির্ভাগে আসিয়াছে; এই সকল নলের মুখকে লোমকূপ বলে। এই লোমকূপ-দ্বারা ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয়।

ঘর্ম্ম অদৃশ্যরূপে আমাদের শরীর-হইতে বাষ্পাকারে সর্ব্বদা নির্গত হইতেছে; অধিক হইলেই উহা জলীয় ভাবে নিঃসৃত হয়। মূত্রাশয়, অন্ত্র এবং ফুস্‌ফুস্‌-দ্বারা যেমন শরীরের পরিত্যক্ত দ্রব্য বহির্গত হয়, ঐরূপ দ্রব্য চর্ম্মদ্বারাও অধিক পরিমাণে বহির্গত হইয়া থাকে। ন্যূনকল্পে চর্ম্মদ্বারা প্রায় এক সের পরিমাণে এইরূপ দ্রব্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে যে, ঘর্ম্মরোধ হইলে, কি নিমিত্ত স্বাস্থ্যের এত বিঘ্ন হইয়া থাকে।

যে সকল দূষিত পদার্থ ঘর্ম্মদ্বারা বহির্গত হয়, ঘর্ম্মরোধ হইলে তাহারা শরীর-মধ্যে থাকিয়া যায় এবং ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ,

অন্ত্র বা মূত্রাশয় স্ব স্ব কার্য্যের অতিরিক্ত এই চর্ম্মের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে যে যন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল থাকে, প্রথমে সেইটীরই রোগ জন্মে। যে ব্যক্তির সমুদয় যন্ত্র সুস্থ অবস্থায় থাকে, তাহার সামান্য অসুখ-মাত্র লক্ষিত হয়। এই কারণে অধিকক্ষণ শীতল বায়ু গাত্রে লাগাইলে, অথবা শীতল জলে গাত্র সিক্ত করিলে, ঘর্ম্মরোধ হইয়া উদরাময়, কাশ ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, দেহিমাত্রেরই বিশেষ যত্নসহকারে সর্ব্বদা গাত্র পরিষ্কার রাখা নিতান্ত আবশ্যক। জলই ইহার প্রধান উপায়। নিয়মিতরূপে জলদ্বারা গাত্র ধৌত করিলে ঘর্ম্ম, গাত্রমল প্রভৃতি দূষিত পদার্থ বিধৌত হইয়া, লোমকূপসকল পরিষ্কৃত হয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে স্নান অত্যন্ত হিতজনক, ইহাতে শারীরিক বল বর্দ্ধিত করে, শোণিত বিশুদ্ধ হয়, মনের প্রফুল্লতা জন্মে, এবং শরীর স্নিগ্ধ হয়।

স্নান। দেহ পরিষ্কার করাই স্নানের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ইহাতে শরীর স্নিগ্ধ এবং মন প্রফুল্ল হয়। শরীর তাপিত হইলে স্নান করিলে, উহা সুস্থ হয়। স্নানদ্বারা পরিশ্রম-বা-শোক-জনিত শারীরিক ক্লেশের অনেক লাঘব হয়। ঋতু, শারীরিক অবস্থা, ও ধাতু-বিশেষে স্নান শীতল বা উষ্ণ জলে হওয়া আবশ্যক।

প্রাতঃস্নান। প্রত্যূষে, অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের কিয়ৎকালপরে, স্নান করিবার উত্তম সময় এবং এই সময়ে সুস্থ শরীরে প্রত্যহ স্নান অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে প্রাতঃস্নান বিশেষ স্বাস্থ্যকর, এই জন্য আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহার অনুমোদন

বিশেষরূপে করিয়া গিয়াছেন। গ্রীষ্মকালহইতে প্রাতঃস্নান অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে কি শীত, কি বর্ষা, কোন ঋতুতেই এ সময়ে স্নান করিতে কষ্ট বোধ হইবে না।

গরম জল-অপেক্ষা শীতল জলে স্নান অভ্যাস করাই অধিকতর কর্ত্তব্য। উহাতে শরীরের সামর্থ্য হয়, রক্তের তেজ হয় এবং কফ কাসী প্রভৃতি রোগদ্বারা সর্ব্বদা কষ্ট পাইতে হয় না। উষ্ণ জলে স্নান অভ্যাস করা নিতান্ত অবিধেয়। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, ঘর্ম্ম অধিক পরিমাণে নির্গত হয় এবং অল্প শীত বা শিশির গাত্রে লাগিলেই পীড়া জন্মে।

অবগাহন। স্রোতের জলে প্রাতে অবগাহন করিয়া স্নান করাই নিতান্ত স্বাস্থ্যকর। নদীর অভাবে উত্তম পুষ্করিণীতেও অবগাহন স্নান হইতে পারে। অবগাহন স্নান অতিশয় তৃপ্তিজনক; এবং শরীরের মলা উহাতে অতি সহজে দূর হয়। উহাতে অঙ্গচালনার বিশেষ সুবিধা থাকে বলিয়া ব্যায়ামজনিত সুখানুভবও করা যায়। নদী বা পুষ্করিণীর জল বায়ু অপেক্ষা অধিকতর শীতল, এ নিমিত্ত উহাতে হঠাৎ অবগাহন করিলেই শরীর শীতল হয় ও বাহিরের রক্ত অন্তরস্থ যন্ত্রাদির দিকে পরিধাবিত হইতে থাকে এবং ত্বকে রক্তের হ্রাসতাপ্রযুক্ত শরীরে শীত অনুভূত হয়। ক্ষীণদেহে কম্প উপস্থিত হইয়া বিশেষ অপকার হইতেও পারে। কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ হইলে, হৃদয়যন্ত্রদ্বারা রক্ত সর্ব্ব শরীরে পুনশ্চালিত হয় এবং ধমনী প্রভৃতি শিরায় অধিক রক্ত প্রবাহিত হইয়া শরীর শীঘ্র তপ্ত ও সতেজ হইয়া থাকে। পাছে মস্তকে অধিক রক্ত ধাবিত হইয়া ক্লেশদায়ক হয়, এই

নিমিত্ত আমাদের শাস্ত্রকারেরা অগ্রে মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া, তবে অবগাহনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, এবং এই নিয়মটি অদ্যাবধি অনেক ব্যক্তিকেও প্রতিপালন করিতে দেখা যায়।

বলিষ্ঠ শরীরে এককালে শীতল জলে অবগাহন করিলে বিশেষ অনুপকার না হইতে পারে, কিন্তু রুগ্ন ও ক্ষীণদেহে সেরূপ করা উচিত নহে। এই জন্য গামছা ভিজাইয়া মুখ, গলা, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি অগ্রে মুছিয়া তবে সর্ব্বশরীর জলে মগ্ন করা কর্ত্তব্য। কেবল পদ বা অর্দ্ধ অঙ্গ জলে ডুবাইয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা অতিশয় নিষিদ্ধ। গর্ভিণীদিগের এই নিয়মটির প্রতি বিশেষ মনোযোগিনী হওয়া কর্ত্তব্য।

নদী বা পুষ্করিণীর অভাবে তোলা জলে স্নান করিতে হয়; কিন্তু জল যদি মন্দ হয়, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে উহাতে স্নান করা বিধেয়। ৫ হইতে ২০ মিনিট-পর্য্যন্ত স্নানের পক্ষে যথেষ্ট সময়, ইহার অধিক ক্ষণ হইলে, পীড়া হইতে পারে; তবে অভ্যাসবশতঃ ইহার অধিক ক্ষণও সহ্য হইতে পারে। রুগ্ন বা ক্ষীণ শরীরে এবং শিশুদিগের পক্ষে প্রত্যূষে না হইয়া, কিঞ্চিৎ বেলায় উষ্ণজলে স্নান করা উপযুক্ত। প্রত্যহ এক সময়ে স্নান করা উচিত, তাহাতে শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যও নিয়ম-অনুসারে হইতে পারে।

রুগ্ন বা ক্ষীণ শরীরে ঘরের মধ্যে বায়ুরোধ করিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য, কারণ সে সময়ে শীতল বাতাস গাত্রে লাগিলে পীড়া হইতে পারে। শ্রমান্তে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া স্নান করা উচিত, কারণ উত্তপ্ত শরীর সহসা শীতল করিলে, ঘর্ম্মরোধ

হইয়া পীড়াদায়ক হয়। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে স্নান করা অবৈধ। স্নানের পর অধিকক্ষণ আর্দ্র বস্ত্র ধারণ করা অবিধেয়; কারণ শরীরের উত্তাপে বস্ত্রকে শুষ্ক হইতে দিলে, শরীরের তাপের হানি হয়। গৃহ হইতে দূরে স্নান করিতে যাইতে হইলে, সঙ্গে স্বতন্ত্র বস্ত্র লওয়া বিহিত।

গাত্রমার্জ্জন। স্নানের সময় গাত্রমার্জ্জনীদিয়া গাত্র উত্তমরূপে মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। পরে স্নান সাঙ্গ হইলে, প্রথমে ভিজা গামছাদিয়া গাত্র পুঁছিয়া, শুষ্ক বস্ত্র বা তোয়ালেদ্বারা গাত্র উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিতে হইবে, অন্ততঃ ৪।৫ মিনিট গাত্র ঘর্ষণ করিলে, শরীরের স্বাভাবিক তাপ উদ্ভূত হয়। বক্ষঃস্থল, উদর এবং গ্রন্থিস্থলসকল বিশেষরূপে ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

তৈলমর্দ্দন। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই শরীরে তৈলমর্দ্দন করিয়া থাকেন। ইহা আমাদিগের একটী দেশীয় প্রথা বলিতে হইবে। ইহাতে উপকার ভিন্ন বিশেষ কোন অপকার দৃষ্ট হয় না। তৈল ব্যবহার না করিয়া স্নান করিলে, লোমকূপ হইতে যে একপ্রকার তৈলবৎ পদার্থ বহির্গত হয়, তাহা ধৌত হইয়া চর্ম্মের কোমলত্বের হানি হয়। এতদ্ভিন্ন লোমকূপদ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে তৈল শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উপকার আছে, এই নিমিত্ত অধিকক্ষণ ধরিয়া তৈলমর্দ্দন করিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য। তৈল গাত্রে মাখিলে, শরীর মসৃণ, চিক্কণ ও সুস্থ হয় এবং কেশ কৃষ্ণবর্ণ থাকে। তৈলদ্বারা চর্ম্ম কোমল না রাখিলে, উহা কঠিন হইয়া পড়ে এবং সময় সময় ফাটিয়া যায়। শীতকালে আমাদের শরীরে তৈলের বিশেষ আবশ্যকতা

হইয়া উঠে; ইহা ব্যবহার না করিলে,গাত্রে খড়ী উঠিতে থাকে এবং স্থানে স্থানে চর্ম্ম ফাটিয়া ক্লেশকর হয়। ধাতুবিশেষে তৈল শরীরকে স্নিগ্ধ করে। আয়ুর্ব্বেদমতে কবিরাজেরা নানাপ্রকার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। অন্যান্য রোগ-অপেক্ষা বায়ুরোগে উহার ফল বিশেষতর লক্ষিত হয়। লোকে সচরাচর সর্ষপ তৈল গাত্রে মাখিয়া থাকে। সর্ষপ তৈলে গন্ধকের ভাগ আছে, এই নিমিত্ত ইহাতে ব্রণ চুল্কুনী প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বা নারিকেল ও তিলের তৈল ব্যবহার করে। শেষোক্ত দুইপ্রকার তৈল অপেক্ষাকৃত শীতলগুণবিশিষ্ট; এই নিমিত্ত উহা রুক্ষ ধাতুতে বিশেষ উপকারী। তিলতৈল গন্ধদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া "ফুলেল" তৈল হয়, এই নিমিত্ত শ্লেষ্মাযুক্ত ধাতুতে উহা সহ্য হয় না। তৈল গাত্রে লেপন করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া ফেলা উচিত, নচেৎ মলা সঞ্চিত হইয়া লোমকূপ বদ্ধ করিতে পারে।

মলিন বসন পরিধান বা অপরিষ্কার শয্যায় শয়ন করা অকর্ত্তব্য; তাহাতে শরীরে মলা সংযুক্ত হইয়া পীড়াদায়ক হইতে পারে। পরিধান বস্ত্র গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ দুইবার এবং শীতকালে অন্ততঃ একবার পরিত্যাগ করা উচিত। ঘর্ম্মসিক্ত দুর্গন্ধময় কাপড় পরিধান করা অকর্ত্তব্য। শয্যা প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ; অন্ততঃ এক সপ্তাহ-অন্তে উহার উপরের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। অপরিস্কৃত অবস্থায় থাকিলে পাঁচড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্ম্মের রোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা। অন্য লোকের গামছা ব্যবহার, বস্ত্র পরিধান বা শয্যায় শয়ন করা অনুচিত; তাহাতে নানাপ্রকার স্পর্শাক্রামক পীড়া হইতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

পরিধেয়।

মনুষ্যচর্ম্ম পশুচর্ম্মের ন্যায় কোন বিশেষ স্বাভাবিক আচ্ছাদনদ্বারা আবৃত না থাকায়, আমাদিগের দেহ শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি বা রৌদ্র-হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত বস্ত্রের আবশ্যক হয়। মনুষ্যেরা বুদ্ধি ও কৌশল-দ্বারা নানাবিধ উপযুক্ত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু নীচপ্রাণিরা সেরূপ পারে না, এই নিমিত্ত তাহাদের চর্ম্ম স্বভাবতঃই উপযুক্ত আচ্ছাদনদ্বারা আবৃত থাকে। দেশ-বিশেষে শীত বা গ্রীষ্মাতিশয্য-অনুসারে প্রাণিদিগের চর্ম্ম উপযুক্ত আবরণে আবৃত থাকে। শীতপ্রধান দেশের জন্তুদিগের চর্ম্মের নীচে যথেষ্ট পরিমাণে বসা থাকাতে, তাহাদের দেহ উষ্ণ থাকে। সমশীতোষ্ণ দেশের জন্তুদিগের ত্বকের নীচে যদিও বসা তত পরিমাণে থাকে না, তত্রাচ তাহাদিগের চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত স্থূল ও লম্বা পশমের ন্যায় লোমে আবৃত। শীতকালে এই সকল লোম বর্দ্ধিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে উহা পাতলা ও হ্রস্ব হইয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্তুদিগের গাত্রে বসার ভাগ অল্প এবং তাহাদের লোমও তাদৃশ দীর্ঘ ও ঘন নহে।

কার্পাস, পাট, রেশম, তসর, গরদ, পশম ইত্যাদি দ্রব্যের দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি।

কার্পাস-অপেক্ষা রেশম ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্রকে আমরা অধিক-তর গরম বলিয়া থাকি, তাহার কারণ, উহাদ্বারা শরীর আচ্ছাদিত হইলে, উহার অপরিচালকতা-গুণ-বশতঃ শরীরের স্বাভাবিক তাপ বহির্গত হইয়া যাইতে পারে না; এই জন্য শীত-কালে রেশম ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্রদ্বারা আমাদের শরীরের তাপ অধিক পরিমাণে রক্ষিত হয়। আমাদের দেশে শীত তত প্রবল নয় এবং কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রদ্বারাই শীত একরূপ নিবারিত হইতে পারে; কিন্তু স্থানবিশেষে এবং দুর্ব্বল শরীরে রেশম বা পশম নির্ম্মিত বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ফ্লানেল বা অন্যান্য পশমী বস্ত্র শরীরে নিয়ত ধারণ করা উচিত নয়, তাহাতে নানা দোষ ঘটিতে পারে। উহা শীতপ্রধান দেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী। আমাদের দেশে ত্বকের উপরেই ফ্লানেল প্রভৃতি ধারণ করিয়া, তাহার উপর অন্যান্য বস্ত্র পরিধান করিলে, ত্বকের শীত সহ্য করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহার অনেক হ্রাস হইয়া পড়ে; পরিশেষে ক্ষণৈক কালের নিমিত্ত ফ্লানেল পরিত্যাগ করিলেই, শরীর শীতল হইয়া কফ কাসী প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

ঋতুবিশেষে বস্ত্রের পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে কার্পাস বা রেশমনির্ম্মিত পাতলা কাপড় ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু শীতকালে উহার পরিবর্ত্তে পশম বা কার্পাসনির্ম্মিত মোটা-কাপড় পরিধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, ঋতুপরিবর্ত্তনকালে শরীরকে বিশেষরূপে আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। শীতকাল উপস্থিত হইবার কিছু দিন পূর্ব্বহইতেই শীতবস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য

এবং শীত অন্তে সহসা শীতবস্ত্র পরিত্যাগ করা অবৈধ। বয়ঃক্রম-অনুসারে শরীর অধিক বা অল্প পরিমাণে আচ্ছাদিত রাখা আবশ্যক। শৈশব ও বৃদ্ধাবস্থায় শরীর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আবৃত রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

পরিধেয় বস্ত্র এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে অঙ্গপরিচালনের কোন ব্যাঘাত না হয়। আর্দ্র বস্ত্র ক্ষণৈককালের নিমিত্তেও ধারণ করিলে, পীড়াদায়ক হইতে পারে।

পরিধের বস্ত্র ঘর্ম্মযুক্ত হইলে, উহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে এবং উহা পুনর্ব্বার পরিধান করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। শ্বেতবর্ণের কাপড় শীঘ্র মলিন হয় বলিয়া অনেকে রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহা করায় ক্ষতি নাই, কিন্তু উহাও সময় সময় ধৌত করা কর্ত্তব্য, যে হেতু, উভয়প্রকার বস্ত্রই বস্তুতঃ সমতুল্যরূপে মলিন হইয়া থাকে, তবে দেখিতে তাদৃশ বোধ হয় না।

অবস্থানুসারে বসন যে প্রকার হউক, উহা পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। অপরিস্কৃত বহুমূল্য বসন পরিধান-অপেক্ষা পরিস্কৃত চীর বসন-পরিধান করা ভাল। নিতান্ত গরিব লোক-ব্যতীত আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দুইপ্রকার কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে। এক সুট কাপড় অষ্টপ্রহর বাটীতে ব্যবহার করা হয়, আর এক সুট পোষাকি কাপড় বাহিরে যাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র থাকে। এ প্রথা মন্দ নয়; অষ্টপ্রহর যে কাপড় ব্যবহৃত হয় তাহা প্রত্যহ প্রায় দুইবার ধৌত করা হইয়া থাকে; কিন্তু পোষাকি কাপড় সেরূপ না হওয়াতে দোষের কারণ হয়। পোষাকি

কাপড় অন্ততঃ চারি দিবস ব্যবহার করিয়া পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইদানীন্তন অনেকে সকল ঋতুতেই মোজা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরূপ করায় কোন কারণে শীতল বায়ু বা জল পদদ্বয়ে সংযুক্ত হইলেই পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। পদদ্বয় উষ্ণ ও মস্তক শীতল রাখা কর্ত্তব্য। মোজাদ্বারা পদদ্বয় আবৃত রাখিলেই যে, উহা উষ্ণ থাকে এমত নহে, উহাতে বরং রক্তসঞ্চালনের বাধা হইয়া পদদ্বয় শীতল হইতে পারে। পদদ্বয় মধ্যে মধ্যে প্রক্ষালন করিয়া উত্তমরূপ মার্জ্জনা করিলেও উহা উষ্ণ থাকিতে পারে। পদদ্বয় অপরিস্কৃত হইলেই তৎক্ষণাৎ শীতল জলে ধৌত করা এবং শুষ্কবস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত করার প্রথা আমাদের দেশে চিরকাল আছে। এরূপ করায় পদদ্বয়ে উত্তমরূপ রক্ত সঞ্চালন হইয়া উহাকে উষ্ণ রাখে।

শুভ্রপদার্থে সূর্য্যের বা অন্যপ্রকার তাপ লাগিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শুভ্র বস্ত্র ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য এবং তাহাই আমরা অধিকাংশ ব্যবহার করিয়া থাকি। গ্রীষ্মকালে কাল বর্ণের বস্ত্র পরিধান করা উচিত নয়, কারণ উহা তাপ শোষণ করিয়া শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে। রৌদ্রে বা বৃষ্টিতে বেড়াইতে হইলে ছাতাদ্বারা শরীরকে আচ্ছাদিত করা আবশ্যক; কারণ রৌদ্র লাগাইলে বা বৃষ্টিতে ভিজিলে, জ্বর প্রভৃতি উৎকট রোগ উপস্থিত হইতে পারে। রৌদ্রে বেড়াইতে হইলে, শুভ্রবস্ত্র পরিধান ও শুভ্রবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত ছত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পদদ্বয় কর্দ্দম, জল ও রাস্তার প্রখর উত্তাপহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত জুতা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের পুরুষদিগের মধ্যে যে সকল বস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা এক প্রকার নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু এতদ্দেশের স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় নিতান্ত জঘন্য এবং নিন্দনীয়। তাহারা কেবল একখানি বসন পরিধান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা না দেহাবরণ, না শীত নিবারণ হয়। ইদানীন্তন কেহ কেহ জামা ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই উপযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার-অভাবে শীতজনিত কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। আমাদের স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয়-বস্ত্র-সম্বন্ধে কোন সুপ্রণালী অবলম্বন করা নিতান্ত বিধেয়।

নবম অধ্যায়

পরিশ্রম।

মনুষ্যনির্ম্মিত যন্ত্রসকল সর্ব্বদা চালিত অবস্থায় না রাখিলে, যেমন মর্চে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়, আমাদের শরীরযন্ত্র ও সেই-রূপ পরিশ্রমদ্বারা উত্তেজিত না রাখিলে, ক্রমে রুগ্ন হইয়া পড়ে। আবার যন্ত্রসকল অতি চালিত হইলে, যেমন শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যদেহে মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমের বাহুল্য হইলেও সেইরূপ শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। অতএব শ্রম-

বিষয়ে পরিমিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শরীরের অঙ্গসকল উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইলে, তাহা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, নচেৎ উহা শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরিশ্রমদ্বারা শারীরিক ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনেক পরিমাণে পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

নিঃশ্বাসকার্য্য। শারীরিক পরিশ্রমের প্রধান ফল ফুসফুস যন্ত্রে বিশেষ লক্ষিত হয়। পরিশ্রম করিলে ফুসফুসের মধ্যে রক্তের চালনা দ্রুত হয় এবং নিঃশ্বাসিত বায়ু ও প্রশ্বাসিত অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ডাক্তার স্মিথ বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, নিঃশ্বাসদ্বারা ফুস ফুস মধ্যে শয়ন করিলে ১ ভাগ বায়ু প্রবেশ করে,

উপবেশন করিলে	... ...	$১\frac{১}{৫}$ ভাগ	...	...
দণ্ডায়মান হইলে	... ...	$১\frac{১}{৩}$ ভাগ	...	...
গান করিলে	... ...	$১\frac{১}{৪}$ ভাগ	...	...
প্রতি ঘণ্টায় অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যটন করিলে		$১\frac{৩}{৪}$ ভাগ	...	...
ঐ এক ক্রোশ ঐ		$২\frac{৩}{৪}$ ভাগ	...	...
ঐ দেড় ক্রোশ ঐ		$৩\frac{১}{৪}$ ভাগ	...	...
ঐ দুই ক্রোশ ঐ	...	৫ ভাগ	...	...
ঐ তিন ক্রোশ ঐ	...	৭ ভাগ	...	...
১৬ সের বোঝা বহন করিয়া হাঁটিলে		৩ ভাগ	...	...

৩১ সের বোঝা লইয়া হাঁটিলে	...	$৩\frac{৩}{৪}$	ভাগ বায়ু প্রবেশ করে	
১॥/ মণ বোঝা বহন করিয়া চলিলে		$৪\frac{৩}{৪}$	ভাগ	....
ঘোটকে আরোহণ করিয়া দৌড়াইলে		৪	ভাগ	....
এবং সন্তরণ দিলে	... ...	$৪\frac{৩}{৪}$	ভাগ	....

এই সকল পরিশ্রমদ্বারা যেমন নিঃশ্বাসিত বায়ুর ভাগ বর্দ্ধিত হয়, উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্বাসিত বায়ুর অঙ্গারক বাষ্পের ভাগও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। পরিশ্রম না করিয়া সমস্ত দিবস এক স্থানে বসিয়া থাকিলে, যে পরিমাণে বায়ু ফুসফুসমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তাহার অর্দ্ধেকও প্রবিষ্ট হইতে পারে না, এবং তাহাতে ফুস্ফুস্ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হয়।

রক্তসঞ্চালনক্রিয়া। পরিশ্রমদ্বারা হৃদয়ের কার্য্য বৃদ্ধি হয় এবং অধিক রক্ত দ্রুতবেগে সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হয়। হৃদয়ের মধ্যে অধিক রক্ত প্রবেশ করাতে উহা চঞ্চল হয় এবং উহার আঘাত বর্দ্ধিত হয়। যদি স্থির অবস্থায় হৃদয়ের আঘাত এক মিনিটে ৭০ বার হয়, তবে কোন প্রকার পরিশ্রম করিলে উহার আঘাত এক মিনিটে ১০০ বা অধিক বার হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ও অনিয়মিত পরিশ্রম করিলে হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পীড়াক্রান্ত হইতে পারে; আবার পরিশ্রম একেবারে না করিলে হৃদয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে বসা জন্মিয়া উহার বিশেষ অনিষ্ট করে। এই নিমিত্ত পরিশ্রমবিষয়ে পরিমিতাচারী হওয়া নিতান্ত বিধেয়।

চর্ম্ম। পরিশ্রমদ্বারা চর্ম্ম মধ্যে অধিক রক্ত সঞ্চালিত হইয়া উহাকে উষ্ণ ও আরক্তবর্ণ করে এবং অধিক পরিমাণে ঘর্ম্মনির্গত হয়। ঘর্ম্মদ্বারা জল, কতিপয় প্রকার লবণ, অম্ল, প্রভৃতি ক্লেদ সকল শরীর হইতে অধিক পরিমাণে বহির্গত হইয়া যায়।

মাংসপেশী। পরিশ্রম করিলে মাংসপেশীসকল সতেজ ও শক্ত হয়। নৌকা বা জাহাজের নাবিক, লৌহকর্ম্মকার মোট-বাহক, প্রভৃতি শ্রমজিবী লোকদিগের মাংসপেশী প্রায় স্থূল ও কঠিন হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ু। শারীরিক পরিশ্রম না করিলে উহারা ক্রমে নিঃস্তেজ হইয়া পড়ে এবং নানাপ্রকার বায়ুরোগ উপস্থিত হইয়া শরীরকে নষ্ট করে।

পরিপাক। পরিশ্রমদ্বারা ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং পরিপাক ও শোধনকার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়। পরিশ্রম করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য খাদ্যের ভাগও বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ যবক্ষারজানময়, তৈলাক্ত ও লবণবিশিষ্ট পদার্থের প্রয়োজনই অধিক হইয়া থাকে। পরিশ্রমের সহিত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে, অজীর্ণদোষের বিশেষ উপকার হয়। পরিশ্রমদ্বারা যন্ত্রমাত্রেরই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদিত হয় এবং মল-মূত্রাদি পরিস্কৃতরূপে বহির্গত হইয়া যায়। শ্রমহীন হইয়া আহারের বাহুল্য করিলে, অধিক বসা জন্মিয়া শরীরকে নিতান্ত অপটু করিয়া ফেলে এবং নানাপ্রকার কষ্টকর রোগ উপস্থিত হয়। বিচারপতি ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ, যাহারা সমস্ত দিবস একস্থানে বসিয়া কার্য্য করেন, কিম্বা গ্রন্থকার বা সম্পাদকগণ

যাহারা শ্রমশূন্য হইয়া নিয়ত তাহাদের মস্তিষ্ক পীড়ন করেন, তাহাদিগের মস্তিষ্কের মধ্যে যথাপরিমাণে রক্তের সঞ্চালন না হইলে বিবেচনাশক্তির ক্রমে হ্রাস হয়, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। সবল ব্যক্তিদিগের এই রক্তের পূরণ শরীরের অন্য স্থান হইতে হইয়া থাকে এবং সেই সকল স্থান তাহাদিগের যথাপরিমাণ রক্তহইতে বঞ্চিত হইয়া প্রায় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত ক্ষুধার হ্রাস হয়, অজীর্ণ দোষ ও মল মূত্রের বিঘ্ন জন্মে এবং শরীর ক্ষীণ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। এই সকল অনিষ্ট অতি সামান্য উপায়দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। সমস্ত দিবসের পর, কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে পদব্রজে বা অশ্ব-আরোহণে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে, রক্ত পুনর্ব্বার উত্তেজিত ও উহার পরিচালন পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বের দুর্ব্বলতা ও অসচ্ছন্দতা দূর হইতে পারে।

ছাত্রগণের কর্ত্তব্য। ইহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ছাত্রদিগের আশা, ভরষা, বা ভবিষ্যৎ যে কোন সুখ, সকলই তাহাদিগের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। অজীর্ণতা, বাত, পক্ষাঘাত বা অন্য কোনপ্রকার দীর্ঘকাল-ব্যাপক রোগদ্বারা শরীর অপটু হইয়া পড়িলে, উহার সঙ্গে সঙ্গে মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং তদবস্থায় লেখাপড়া বা অন্য কোন কার্য্যই উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব। অতএব ছাত্রদিগের ইহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যে, স্বাস্থ্যই তাহাদিগের মূলধন এবং যে কোনপ্রকারেই হউক, উহার রক্ষণাবেক্ষণে নিরন্তর যত্নবান্ হওয়া বিধেয়।

ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছাত্রেরা বাল্যকালের স্বাভাবিক বল ও স্ফূর্ত্তিসহকারে স্বাস্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, এবং অনেকে লেখা পড়ায় দৃঢ়ব্রতী হইয়া স্বাস্থ্যের প্রতি অহিতাচার করে। সামান্য পীড়া হইলে বালকেরা তাহা বড় গ্রাহ্য করে না। এইরূপ বারম্বার অবহেলার পর, শরীর যখন ক্রমে অধিক রুগ্ন হইয়া পড়ে, তখন বিদ্যা-ভ্যাসে ক্রমে ব্যাঘাত জন্মিতে থাকে; পরে রোগ উত্তরোত্তর বদ্ধমূল হইয়া পড়িলে, তাহাদিগকে লেখাপড়ায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। ছাত্রেরা যত অধিক বুদ্ধিজীবী হয়, তাহাদের আশাও তত উচ্চ হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা লাভে উন্মত্ত হইয়া ও অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে সচেষ্টিত হইয়া, তাহারা ততই স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলন করে এবং অনেকে রুগ্ন হইয়া শীঘ্র কালকবলে পতিত হয়।

অনেকে অনাবশ্যক মনে করিয়া পরিশ্রম করে না; কিন্তু ইহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ইহা ইচ্ছার কর্ম্ম নহে। পরিশ্রম অবশ্যই করিতে হইবে, নচেৎ ভবিষ্যতে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অনেকে বলিয়া থাকে যে, তাহারা লেখাপড়ায় এত ব্যস্ত যে শারীরিক পরিশ্রম করিবার অবকাশ থাকে না; এটি তাহাদের নিতান্ত ভ্রম। প্রত্যহ একটি নির্দ্ধারিত সময়ে কিয়ৎ-ক্ষণ পরিশ্রম করিবার অভ্যাস করিলে, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, বিনা পরিশ্রমে যে কর্ম্ম যে সময়ের মধ্যে নির্ব্বাহিত হইত, পরিশ্রমের পর সেই কার্য্য অতিসহজে ও অল্প সময়ে নির্ব্বাহিত

হইবে। কারণ মন ও শরীর পরিশ্রমের দ্বারা উত্তেজিত হইলে, সকল কর্ম্মই অল্প আয়াসে সাধিত হইতে পারে।

পরিশ্রম করিলে, আয়ু বৃদ্ধি এবং মন সতেজ হয়। যে ছাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উচ্চসোপানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, সে নিয়মিত পরিশ্রমদ্বারা শরীরকে পুষ্ট না রাখিলে সেই আশানুরূপ ফল কখনই লাভ করিতে পারিবে না।

শিশুসন্তান। বাল্যাবস্থায় শরীর অতি কোমল থাকে এবং এই সময় যথানিয়মে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা না করিলে, তাহারা সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে পারে না। অনেক পিতামাতা তাহাদিগের সন্তানদিগের লেখাপড়ার প্রতি অতিরিক্ত যত্নবান্ হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একস্থানে বদ্ধ করিয়া নিয়ত পাঠে নিযুক্ত রাখেন; ইহা অপেক্ষা অধিকতর ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। শিশুদিগের পাঠের সময় মধ্যে মধ্যে অবকাশ এবং খেলিবার ছলে পরিশ্রম করিতে দেওয়া আবশ্যক। এককালে অধিকক্ষণ পড়িতে না দিয়া ক্ষণৈক পড়িতে ও ক্ষণৈক খেলিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক অবস্থায় পশু-শাবকগণ ক্ষণৈক আরাম করিয়া তৎপরেই আবার দৌড়াদৌড়ী করে। শিশুরা এক স্থানে বসিয়া কোন এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মন স্থির রাখিতে পারে না। এক সময়ে দুই বা তিন ঘণ্টার অধিক কাল বালক বা বালিকাদিগকে পাঠে নিযুক্ত রাখা উচিত নয়। এমন সকল খেলায় ইহাদিগকে সময়ে সময়ে নিযুক্ত রাখা উচিত, যাহাতে সমস্ত শরীরের, বিশেষতঃ হস্ত, পদ, বক্ষঃ, ও পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীর উত্তমরূপ চালনা হয়। ৭ হইতে ১৬

বৎসর বয়ঃক্রমপর্য্যন্ত পদব্রজে চলিয়া পরিশ্রম করা অপেক্ষা নানাপ্রকার ক্রীড়াদ্বারা শ্রম করা ভাল। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে চলন যত উপকারী, যুবাদিগের পক্ষে উহা তত ফলদায়ক নহে। এমন সকল ক্রীড়া, যাহাতে শরীরের প্রায় সকল স্থানের মাংসপেশীর বিশেষরূপ চালনা হয় এবং গ্রন্থিসকলের উত্তমরূপ ঘর্ষণ হয়, তাহাই যুবাদিগের পক্ষে উপযুক্ত। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল বালকদিগকে অল্পে অল্পে সমান্যহইতে গুরুতর পরিশ্রম অভ্যাস করাইলে, উহারা শীঘ্র পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।

ব্যায়াম।—ইহা নানা প্রকার। অশ্বারোহণ, শকট বা নৌকা আরোহণ, পদব্রজে ভ্রমণ, দৌড়ান, মুগদর ভাঁজা, ডন্‌ফেলা, কুস্তী, মল্লক্রীড়া ও অন্যান্য কস্ত (Gymnastic), সন্তরণ, দাঁড়টানন ইত্যাদি।

অশ্বারোহণ একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহাতে ব্যায়াম এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন যুগপৎ হইয়া থাকে। পদব্রজে ভ্রমণ আর একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। প্রত্যহ প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যার প্রাকালে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইলে, শরীর অতি-সচ্ছন্দ থাকে। ইহা সকলেরই সাধ্য, কেবল মনস্থ করিলেই অনায়াসে হইতে পারে। সন্তরণ আর একটি উত্তম ব্যায়াম, ইহাতে সকল অঙ্গের সম্যক্‌প্রকার চালনা হয়। মুগুর ভাঁজা ডন্ ফেলা, কুস্তী, বহুবিধ কস্ত প্রভৃতি ব্যায়াম মন্দ নহে; কিন্তু অব্যবসায়িদিগের পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নহে। ডন্‌ফেলা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং উহাতে মস্তিষ্কে রক্তের গতি অধিক পরিমাণে হইয়া শীরঃপীড়া জন্মাইতে পারে। কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়ামে

ঘাড়, পঞ্জর এবং অন্যান্য সন্ধিস্থানে কঠিন আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। যাহাদিগকে মানসিক পরিশ্রম কিছুমাত্র করিতে হয় না, তাহাদিগের পক্ষেই এই সকল ব্যায়াম বিশেষ উপযুক্ত। এই সকল ব্যায়ামের আর একটি প্রধান দোষ এই যে, উহা পরিত্যাগ করিলে, দূষিত-রক্ত-জনিত বাত প্রভৃতি রোগে শরীর প্রায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালকেরা বলিষ্ঠ হইবার আশয়ে প্রথমে এই সকল দুরূহ ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হয়, পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত লেখাপড়ায় অধিক রত হইয়া উহার অবহেলা করে এবং অনেকে এক কালেই সে সকল অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া বাত ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হইয়া, অবশেষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অতএব অসাধারণ ব্যায়াম-অপেক্ষা যে সকল ব্যায়ামের অভ্যাস চিরকাল রাখা যাইতে পারে, সেই সকল ব্যায়াম করাই কর্ত্তব্য।

দশম অধ্যায়।

নিদ্রা।

ক্রমাগত শ্রম করিলে, স্নায়ুশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। উহাকে পূর্ব্বাবস্থায় পুনঃস্থাপিত না করিলে বিশেষরূপে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা; সেই জন্য শ্রমের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন। সমস্ত দিবস ক্রমাগত পরিশ্রমের পর শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়, ইতস্ততঃ যাতায়াতে অভিলাষ

থাকে না, সকল বিষয়েই মনের ধারণাশক্তি রহিত হইতে থাকে, ইন্দ্রীয়সকল তেজঃশূন্য হইয়া পড়ে, আলস্য ও জড়তা ক্রমশঃ উপস্থিত হয়, এবং অবশেষে চক্ষুঃ মুদ্রিত হইয়া আসিয়া নিদ্রার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

নিদ্রার পর শরীর ও মন যেন নবতেজোবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তখন পুনর্ব্বার পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে কোন ক্লেশই অনুভূত হয় না। পরিশ্রান্ত ও দুঃখক্লেশার্ত্তের পক্ষে নিদ্রা অতীব মঙ্গলদায়িনী।

গভীর নিদ্রার সময়ে মনের কোন কার্য্যই অনুভূত হয় না; যদি বা তখন মনের কোনরূপ গতি হইয়া থাকে, নিদ্রাক্ষয়ে তাহার কোনপ্রকার স্মৃতিই হয় না; তবে নিদ্রা তাদৃশ গাঢ় না হইলে, মানসিক গতির অনুভব হইয়া থাকে। নিদ্রার এই অবস্থাকে স্বপ্নদর্শন কহে। ইহা নিদ্রিত ব্যক্তির কতকগুলি বাহ্যলক্ষণদ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নিদ্রাবস্থায় কখন মাংসপেশী বা স্নায়ুর চাঞ্চল্যবশতঃ কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আকুঞ্চিত বা উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়, কখনও বা সুপ্ত ব্যক্তি চমকিয়া উঠে, আপনা আপনিই কথা কহে, কিম্বা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে; জাগরিত হইলে এবম্বিধ মানসিকক্রিয়াসকল কাহারও অধিকতর, কাহারও অল্প পরিমাণে স্মরণ থাকে, কেহ বা একবারেই তাহা বিস্মৃত হইয়া যায়।

স্বপ্নাবস্থায় যে সকল ভাব মনে স্পষ্টরূপে উদিত হয়, তাহারা তদুপযোগী শারীরিক যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়গণকে উত্তেজিত করিয়া

কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে; এই কারণবশতঃ কোন কোন ব্যক্তিকে জাগ্রদবস্থা-অপেক্ষা অনেকতর পরিমাণে স্পষ্টতা, কৃতনিশ্চয়তা ও ক্ষমতার সহিত আপনা-আপনি কথোপকথন করিতে, গীত গাহিতে বা স্বয়ং প্রশ্ন করিয়া তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে, দেখা যায়। এরূপ অস্বভাবিক ক্ষমতার এক মাত্র কারণ এই বলিয়া প্রতীত হয় যে, জাগ্রদবস্থায় মন নানাবিধ বাহ্য কারণে আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু সুপ্তাবস্থায় আন্তরিক বৃত্তি যে দিকে ধাবিত হয়, উহা অবাধে সেই দিকে অভিনিবেশ প্রদান করিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি আন্তরিক ভাবের উত্তেজনায় সুপ্তাবস্থায় অবিকল জাগরিতের ন্যায় শয্যাহইতে উত্থিত হইয়া, শয়নগৃহের বাহিরে কিয়দ্দূরে গমনাগমনপূর্ব্বক কোনরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, পুনর্ব্বার নিজ গৃহে আসিয়া, ও পূর্ব্ববৎ দ্বারাদি রুদ্ধ করিয়া, শয্যায় শয়ন করে। ইহাকেই স্বপ্নভ্রমণ (Somnambulism) কহে। এরূপ অনেক স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঈদৃশ অবস্থায় কেহ শয্যাহইতে উঠিয়া স্বয়ং প্রদীপ জ্বালিয়া, লিখিবার উপকরণাদি সংগ্রহপূর্ব্বক সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলেন; কোন গণিতজ্ঞ দিবসে অঙ্ক বা প্রশ্নের কূটতত্ত্বের উদ্‌ভাবন বা মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়েন নাই, কিন্তু সে সময়ে তাহার অতি উৎকৃষ্ট উত্তর লিখিয়া রাখিলেন; কোন কবি বা সংগীতজ্ঞ একটি উত্তম ভাবের কল্পনা বা মধুর গান রচনা করিলেন; অথবা কোন সদ্বক্তা একটি অনতিদীর্ঘ বক্তৃতাই করিয়া ফেলিলেন; কেহ বা এই অবস্থায় তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্য্যসকল অনা-

য়াসেই সম্পন্ন করিতে সমুৎসুক হয়েন; কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তাহারাই আবার এ সকল কার্য্য কাহার অনুষ্ঠিত বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও কুতূহলী হয়েন।

স্বপ্নদর্শনের কোন কোন অবস্থায় আমাদের ইচ্ছার কার্য্যকারিতা থাকে না, কিন্তু মনে নানাবিধ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপরে নানাবিধ বাহ্যিক কারণের প্রভাবই এই সকল বিভিন্ন ভাবোৎপত্তির মূল। পাকস্থলীতে অধিক গুরুপাক ভক্ষ্য অজীর্ণাবস্থায় থাকিলে, নিদ্রাকালে বহুবিধ বিভীষিকাপূর্ণ কুস্বপ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শীতল বায়ু শরীরের উপরদিয়া প্রবাহিত হইলে, নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নে অনুভব হয়, যেন সে শীতল জলে স্নান করিতেছে বা জলমগ্ন হইতেছে; কোনরূপ উজ্জ্বল আলোক হঠাৎ চক্ষুর উপর পতিত হইলে, প্রতীতি হয়, যেন গৃহ দগ্ধ হইতেছে, অথবা কোন একটা সমান্য শব্দ হইলে, বোধ হয়, ভয়ঙ্কর কামানের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া গেল।

নিদ্রার পরিমাণ। শরীরের পক্ষে যে পরিমাণ নিদ্রার আবশ্যক, তাহার ন্যূনাধিক্য হইলে, স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইয়া থাকে। নিদ্রার অল্পতা হইলে স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়, শারীরিকক্রিয়াসকল সম্পূর্ণরূপ সম্পাদিত হয় না, তাদৃশ ক্ষুধা-বোধ থাকে না, পরিপাকশক্তির হানি হয় এবং সেই হেতু শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। নিদ্রা না হইলে, নানাবিধ পীড়া হইয়া থাকে এবং কিছু দিন একবারেই নিদ্রাবিহীন হইলে, মৃত্যুপর্য্যন্তও হইতে পারে।

ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রোম্ দেশের লোকেরা মাসিডোনিয়া দেশের রাজা পার্সিয়াস্‌কে কারারুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে এক কালে নিদ্রা হইতে বঞ্চিত করেন, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এদিকে অপরিমিত নিদ্রাতেও শরীর ও মন অনেক অংশে অপটু ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

কতক্ষণপর্য্যন্ত নিদ্রা গেলে স্বাস্থ্য বিধানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়, তাহার কোন একটি সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারা যায় না। বয়ঃক্রম, শারীরিক সামর্থ্য, দৈনিক পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, স্বাভাবিক অভ্যাস এবং অন্যান্য অবস্থা-অনুসারে নিদ্রার পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। সামান্যতঃ শ্রমপটু যুবকদের পক্ষে নিদ্রার পরিমাণ ছয় বা সাত ঘণ্টা ধরা যাইতে পারে। ইহা-অপেক্ষা অল্পতর কালের মধ্যে অত্যন্ত শ্রমশীল ব্যক্তির শ্রান্তি দূর হওয়া অসম্ভব। ইহা-অপেক্ষা অধিকতর সময়ের আবশ্যক হইলে, তাহা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বলিতে হইবে। শিশুগণ সর্ব্বদা ক্রীড়া-কৌতুকে রত থাকে বলিয়া তাহাদের শারীরিক শক্তিসকল অতিশীঘ্রই হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত তাহাদের অধিকতর বিশ্রামের প্রয়োজন। ছয় বা সাত বৎসর বয়ঃক্রমের শিশুর দিনান্তে দশ বা দ্বাদশ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। ছয় বা সাত-অবধি চতুর্দ্দশ বা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম-পর্য্যন্ত আট বা নয় ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট হইবে; তাহার পর বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ নিদ্রার পরিমাণ লাঘব করা আবশ্যক; তখন সাত বা ছয় ঘণ্টা নিদ্রা যাইলে ক্ষতি নাই। গার্হস্থ্যকর্ম্মনিরতা স্ত্রীলোকদের পক্ষে, বিশেষতঃ যাহা-

দিগকে শিশুসন্তান লালন পালন করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে, পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে নিদ্রার প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহাদিগের পক্ষে অতিরিক্ত আর এক ঘণ্টা সময় উপযুক্ত। মনুষ্যের পরিশ্রম ও কার্য্য-অনুসারে নিদ্রার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রমজীবিরা রাত্রি নয়টার সময়ে শয়ন এবং সমস্ত রজনী গভীর নিদ্রার পর প্রাতঃকালে পাঁচটা বা ছয়টার সময়ে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করে। সমস্ত দিবসের গুরুতর পরিশ্রমই তাহাদের এতাদৃশ গাঢ় সুপ্তির কারণ। অলস ব্যক্তিদিগের শারীরিক পরিচালনা অল্পই হইয়া থাকে; এজন্য তাহাদের নিদ্রার পরিমাণও অতি অল্প। শ্রমশীল ব্যক্তির শারীরিক শক্তির ক্ষয়ের পর নিদ্রাদ্বারা পুনর্ব্বলবিধান যাদৃশ হইয়া থাকে, শ্রমবিহীনের তাদৃশ হইয়া উঠে না। অলস-অপেক্ষা শ্রমরত জনের নিদ্রা যদিও অল্পতর পরিমাণে হইয়া থাকে, তথাপি তাহা অধিকতর প্রগাঢ় ও স্বাস্থ্যদায়ী।

শারীরিক পরিশ্রম-অপেক্ষা মস্তিষ্কের পরিচালনায় বিশেষতঃ অধ্যয়ন-কার্য্যে জীবনীশক্তি অধিকতর পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এই সকল কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অধিকক্ষণপর্য্যন্ত গভীর নিদ্রা প্রয়োজনীয়। ফলতঃ প্রত্যহ যাহাদিগের মানসিক শক্তিকে অনেকক্ষণপর্য্যন্ত পরিচালিত করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে উহার মধ্যে সুযোগ পাইলেই এক ঘণ্টা কাল নিদ্রা বিশেষ ফলদায়ক হইতে পারে; এমন কি দশ মিনিট যদি নিদ্রিত হইয়া দৈনিক কার্য্যের সমস্ত কাঠিন্য বিস্মৃত হওয়া যায়, তাহা হইলেও মানসিক শ্রান্তির অনেক শান্তি

হইয়া থাকে ; কিন্তু এরূপ আচরণ শারীরিকশ্রান্তিবিনাশের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইতে পারে না। এবম্বিধ অবস্থায় যে নির্দ্দিষ্ট সময় নিদ্রার জন্য নির্দ্ধারিত আছে, সেকালপর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য এবং নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত আর এক ঘণ্টা প্রয়োজন বুঝিয়া গৃহীত হইলেও বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রা যাওয়া শরীরের পক্ষে বিশেষ হানিদায়ক। উহাতে গ্রন্থিসকল ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং জড়তা ও জ্বরবৎ-অস্বাস্থ্য জন্মিয়া থাকে। যাহার যে সময়ে অভ্যাস, সে সেই সময়েই নিদ্রা যাইবে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে, অসুখ জন্মিবে বা নিদ্রার নিয়মিত সময়ে ভাল নিদ্রা হইবে না। দিবসে নিদ্রা যাওয়া বিহিত নহে ; ইহাতে পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, বিশেষতঃ প্রায়ই আলস্য হয়, শ্লেষ্মা জন্মে, শরীর অবসন্ন হয় এবং জ্বরবৎ-গ্লানি বোধ হইয়া থাকে ; কিন্তু অভ্যাস থাকিলে, কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। গাঢ় নিদ্রা হঠাৎ ভাঙ্গিলে যেমন মাথা ব্যথা ও অন্যান্য অসুখ উপস্থিত হয়, অভ্যাস থাকিলে দিবসে নিদ্রার ব্যাঘাত হইলেও ঐরূপ অসুখ হইয়া থাকে। দীর্ঘকালব্যাপী বা কঠিন পীড়াহইতে আরোগ্য-লাভের পর সাত বা আট ঘণ্টা অথবা তাহার অধিকতর সময় নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য।

নিদ্রার পরিমাণের একটি সামান্য নিয়ম এই করিয়া রাখিলে চলিতে পারে যে, শিশু ও রোগির পক্ষে নিদ্রার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের প্রয়োজন এবং যাহারা অত্যধিক মানসিক শ্রমে নিরত, তাহাদের পক্ষে আট বা নয় ঘণ্টা নিদ্রা

যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ। শীতকালে সাত বা আট ও গ্রীষ্মকালে ছয় বা সাত ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। শীত কালে নয়টা ও গ্রীষ্মকালে দশটার সময়ে নিদ্রা যাইয়া অতিপ্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে আবার আলস্য বোধ করিয়া বা রাত্রি আছে ভাবিয়া, আর নিদ্রা যাইবে না, কিম্বা তাহার জন্য যত্নও করিবে না। যাদৃশ অভ্যাস, তাদৃশ নিদ্রা যাওয়াই কর্ত্তব্য। কেহ আহার করিবামাত্র, কেহ বা উহার কিয়ৎকালপরেই নিদ্রিত হয়।

নিদ্রার প্রকৃত সময়। রাত্রিই নিদ্রার প্রকৃত সময়। দিনের বেলায় নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক শ্রমে শরীর ও মন নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, সন্ধ্যার পর রাত্রি প্রহরেকমধ্যে নির্ব্বিবাদে নিদ্রার সম্পূর্ণ আবির্ভাব হইয়া থাকে। অনেকে কার্য্যানুরোধে রজনীযোগের সুবিহিত বিশ্রামসময় অতিবাহিত করিয়া দিবসে নিদ্রা যাইয়া থাকে। ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে। যাহারা দিবসে রীতিমত অধ্যয়ন করে, তাহাদের পক্ষে রাত্রি-জাগরণের আবশ্যকই হয় না। অনেকে দিবাভাগ বৃথা কার্য্যে বা আলস্যে নষ্ট করিয়া রাত্রিকালে অধ্যয়ন করে; এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়, ইহাতে নানাপ্রকার রোগ এবং অকালমৃত্যুপর্য্যন্তও হইতে পারে।

সূর্য্যালোকের সহিত উদ্ভিজ্জসমূহের ক্ষয় ও বৃদ্ধির অতি-নিকট সম্বন্ধ। নিম্নশ্রেণীস্থ জীববর্গেরও সূর্য্যের গতি-অনুসারে নিদ্রা ও জাগরণের অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণদ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে, মানববর্গের পরি-

শ্রমের সহিত দিবসালোকের এবং নিদ্রার সহিত রজনীর অন্ধকারের প্রাকৃতিক সম্পর্ক আছে। সূর্য্যকিরণ প্রাণী ও পদার্থমাত্রেরই উত্তাপ ও জীবনীশক্তির আকর। এতাদৃশ মহোপকারক দিবা-অলোকহইতে বঞ্চিত হইয়া নিশাযোগে প্রদীপাদির কৃত্রিম আলোকে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিরত হইলে যে, শারীরিক নানাবিধ দুরবস্থা সংঘটিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কৃত্রিম আলোকে দর্শনেন্দ্রিয়েরও হানি হইতে পারে।

প্রভাতে সূর্য্যালোক অতিমৃদু থাকিয়া ক্রমশঃ বেলাবৃদ্ধির সহিত তীব্র হইয়া উঠে; এই জন্য অতিপ্রভাতে গাত্রোত্থান করিলে ইহা অনায়াসেই সহ্য করা যায় এবং ইহার উত্তরোত্তর তীক্ষ্ণতায় চক্ষুর কোন কষ্ট অনুভূত হয় না। রাত্রির প্রথম সময়ে নিদ্রা গিয়া অতিপ্রত্যূষে প্রত্যহ গাত্রোত্থান করিলে নানাবিধ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য, সামর্থ্য, তেজঃ ও মনের প্রফুল্লতা এবং দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অধিক সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রভাতের সৌন্দর্য্যে ও নবীনত্বে চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হয়। উষ্ণপ্রধান দেশে প্রায় সকল ঋতুতেই প্রভাতের প্রাকৃতিক শোভা অতিরমণীয়। এই সময় সুশীতল স্বাস্থ্যপ্রদ বায়ু সেবনে শারীরিক তেজঃ পুনর্নবীভূত হইয়া আইসে, অন্তঃকরণ প্রফুল্ল ও উৎসাহিত হয় এবং দৈনিকশ্রমে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে।

গভীরনিদ্রার উপযোগী উপায়। শরীরের অবস্থা যাদৃশ থাকে নিদ্রার গভীরতাপক্ষেও তাদৃশ তারতম্য সংঘটিত হয়। রাত্রে আহারান্তেই শয্যায় গমন করা সুবিহিত নহে,

কারণ তাহাতে ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক পায় না এবং অজীর্ণতাদোষজন্য গভীরনিদ্রা না হইয়া প্রায় সমস্ত রজনীই অশান্তিতে যাপন করিতে হয়। অতএব রাত্রিতে ভোজনের পর সুখপ্রদ পুস্তকপাঠে বা আমোদকর সদালাপে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া শয়ন করিলে, অতি সুন্দর সুপ্তিসুখ লাভ হইবে। অজীর্ণতাই সুনিদ্রার একটী প্রধান অন্তরায়, এই নিমিত্ত নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেই অধিক আহার করা অবিধেয়। নানাবিধ চিন্তাপরম্পরার একত্র সমাবেশ হইলে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়। শয়ন করিবার পূর্ব্বে রাগ, বিরক্তি, শোক-প্রভৃতি কষ্টদায়ক ভাবসমূহকে কদাপি আশ্রয় দিবে না, তাহাতে নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। শয়ন করিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের মহিমা কৃতজ্ঞহৃদয়ে চিন্তাকরাই সুগভীর নিদ্রা ও শান্তি লাভের প্রধান কল্প। কোন একটি বিষয়ে মনঃস্থির করিলেই সুনিদ্রা শীঘ্র হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুস্তকাদি পাঠ বা অন্য কোন বিষয়ে একাগ্র-চিত্ততা জন্মিলেই গভীর নিদ্রার আবির্ভাব হয়। যদি কোন উত্তপ্ত গৃহে কোন কার্য্যে বা প্রমোদজনক ব্যাপারে অভিনিবেশ-বশতঃ মন অধিকপরিমাণে উত্তেজিত হয়, তাহাহইলে কিয়ৎকাল অনাবৃতস্থলে সুশীতল বায়ু সেবন করিয়া এবং মুখ হস্ত পদাদি শীতল জলে প্রক্ষালনপূর্ব্বক সমস্ত শরীর উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিয়া শয়ন করিলে, অনায়াসেই সুনিদ্রা উপস্থিত হইবে। যে ব্যক্তি অধ্যায়-নিরত, তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে নিদ্রা যাইবার কিয়ৎক্ষণপূর্ব্বে প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া কোন কৌতুকজনক পুস্তকপাঠে নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তাহা

'ব উপর

হইলে সুনিদ্রা অনায়াসেই হইবে। যদি অধিক রাত্রিতে প... ভোজনদ্বারা অপরিপাক জন্য পাকাশয় স্ফীত হইয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে, তাহাহইলে তাহার শান্তির নিমিত্ত উপযুক্ত ঔষধসেবন করিয়া শয়ন করিবে। সাধারণতঃ, স্বাস্থ্যবিধানের স্বাভাবিক নিয়মসমূহের অনুশরণ করাই গভীর নিদ্রাজাত সুখলাভের সকল অপেক্ষা প্রকৃত পন্থা। রাত্রি ৮ হইতে ১০ ঘণ্টার মধ্যে শয়ন করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, নিয়মিতসময়ে আহার ও নিয়মিতসময়ে বিশ্রাম এবং নিয়মিত পরিমাণে খাদ্য-গ্রহণের রীতি সুনিদ্রাপ্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায়। বিশুদ্ধবায়ু-প্রবাহপূর্ণ অনাবৃত স্থানে কিয়ৎকাল ব্যায়ামচর্চ্চা ইহার তৃতীয় উপায়। গতদিবসীয় প্রত্যেক নিয়োজিত কর্ত্তব্যকার্য্য বিশুদ্ধ-চিত্ততার সহিত সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে বিবেচনায় এবং অদ্য যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় তাহা অদ্যই করা হইয়াছে এই বিবেচনায় স্বতই যে একটি মানসপ্রসাদ জন্মে, তাহাই গাঢ়সুপ্তিলাভের শেষ ও চতুর্থ কৌশল।

শয়নগৃহ অতি সুন্দররূপে বায়ুসঞ্চালনোপযোগী এবং শয্যা ·রিস্কৃত ও বায়ু-বিশুদ্ধ না হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। শয্যার উপকরণ সর্ব্বদা রৌদ্রে দিয়া এবং উহার চাদর ও অন্যান্য আচ্ছাদন প্রত্যহ জলে ধৌত করিয়া এবং উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শয্যা অতিশয় কঠিন বা কোমল হওয়া উচিত নয়। মধ্যম প্রকারের শয্যাই উপযুক্ত। পরন্তু শিশুগণের শয্যা অপেক্ষাকৃত সুকোমল হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কারণ

যে পরিমাণে কার্পাস বা পশমনির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিলে আমাদের দেশে শীতনিবারিত হয়, তদ্দ্বারাই গাত্রাচ্ছাদন করিয়া শয়ন করিবে। শয়নকালে ফ্লানেল বনাত প্রভৃতি গরম জামা পরিধান করিয়া নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়। লেপ বা গাত্রবস্ত্রদ্বারা শীতের ভয়ে মুখনাসিকাদি আবৃত রাখিয়া নিদ্রা যাইলে পুনঃ পুনঃ প্রশ্বাসিত দূষিত বাষ্প গ্রহণে পীড়া হইতে পারে। এক গৃহে অধিক লোকের শয়ন যুক্তিসিদ্ধ নহে, তাহাতেও অনেকের প্রশ্বাসিত বাষ্পদ্বারা গৃহের বায়ু শীঘ্র দূষিত হইয়া নিঃশ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। ঐ কারণে একশয্যায় অনেকের শয়ন করাও অবিধেয়।

নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের তাপ অপেক্ষাকৃত কম হয়, এই কারণেই অনাবৃত স্থানে নিদ্রা যাইলে শৈত্যাধিক্যপ্রযুক্ত শরীর সহজেই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। জাগ্রদবস্থায় হিমভোগে তত অপকারের সম্ভাবনা নাই। রাত্রিযোগে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাওয়া অকর্ত্তব্য; কারণ, বৃক্ষাদির পরিত্যক্ত বিষাক্ত বাষ্প শ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিলে বিশেষ রোগাদি জন্মিবার সম্ভাবনা। বায়ু-প্রবাহমধ্যে শয়ন করা ভাল নয়, তাহাতে শ্লেষ্মাধিক্যহেতু পীড়া জন্মিতে পারে। তাহা বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বাতস্থানে নিদ্রা যাওয়া অতীব নিষিদ্ধ।

শয্যার ঠিক সম্মুখের ও পিছনের জানালা বন্ধ করিয়া উহার পার্শ্ববর্ত্তী সমান অন্তরালে স্থিত বাতায়নাদি খুলিয়া রাখিয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য। কারণ নিদ্রাবস্থায় অধিকক্ষণ শীতল বায়ু গাত্রে লাগাইলে পীড়া জন্মিতে পারে।

নিদ্রাবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অভ্যন্তরীণ যন্ত্রের উপর অধিক ভার পড়িলে নানাবিধ মানসিক কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত হয়। যাদৃশ অবস্থায় শয়ন করিলে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতার সহিত ও সুখে শয়ন করা যায়, তাদৃশ ধরণেই শয়ন করিবে এবং কোন অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে অযথা ভার কদাপি ন্যস্ত করিবে না। চিত হইয়া শয়ন করিলে মেরুদণ্ড ক্লিষ্ট হয় ও বক্ষঃস্থলে ভার বোধ হইয়া বহুবিধ ক্লেশদায়ক স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে। অতএব পার্শ্ব ফিরিয়া ও সময়ে সময়ে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করাই সঙ্গত। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন না করিয়া ক্রমাগত একপার্শ্বে থাকিলে, সেই দিক ব্যথিত হইবার সম্ভাবনা। আহারের অনতিপরেই শয়ন করিতে হইলে দেড় বা দুইঘণ্টা বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া পরে দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিবে, নচেৎ পাককার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া নিদ্রার হানি হইতে পারে।

একাদশ অধ্যায়।

মনোবৃত্তি।

শরীরের সহিত মনের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে উহাদের উভয়ের প্রতি সম্যগ্‌রূপে যত্নবান্ না হইলে স্বাস্থ্যবিধান হওয়া সুকঠিন। মনের সুস্থতা যেরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ আবার মন স্বচ্ছন্দ না থাকিলে শরীর কখনই ভাল থাকে না।

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করা ভাল নয়। উহাতে মস্তকের মধ্যে অপরিমিত রক্তের চালনা হইয়া শিরঃপীড়া হইতে পারে, এবং ঐরূপ অত্যাচার সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে মস্তিস্কে নানাপ্রকার বিকার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। ঐ অত্যাচারে মন অস্থির হয়, বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির হ্রাস হয় এবং কখন কখন পক্ষাঘাত, মূর্চ্ছা বা উন্মাদরোগ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুযন্ত্রের ক্ষয় হয়। এই দুইটী প্রধান যন্ত্রের যত অধিক ক্ষয় হইবে, তত অধিকই আয়ুর অল্পতা হইবে। যে সকল কার্য্যে বা ব্যবসায়ে মস্তিষ্কের অতিরিক্ত পীড়ন হয় এবং মন সর্ব্বদা নিগূঢ় চিন্তায় মগ্ন থাকে, সেই সকল কার্য্য বা ব্যবসায়-নিযুক্ত লোকদিগকে প্রায় অল্পায়ু হইতে দেখা যায়।

নিকৃষ্টবৃত্তিসকলের উপদ্রব হইতে মনকে সর্ব্বদা রক্ষাকরা কর্ত্তব্য। রাগ, দ্বেষ, শোক প্রভৃতির বশীভূত হইয়া মনকে সর্ব্বদা পীড়িত করিলে, মন ও শরীর উভয়ের কেহই ভাল থাকে না এবং শীঘ্র আয়ুঃ ক্ষয় হয়। আহারের পরক্ষণেই অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইলে, পাকযন্ত্রের স্নায়ু সকল উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পারে না। আহার, স্নান, নিদ্রা ইত্যাদি ক্রিয়াসকল প্রফুল্লচিত্তে করা কর্ত্তব্য।

ক্রোধ, দ্বেষাদি যেরূপ স্বাস্থ্যের বিরোধী, ভয়, শোক, নিরাশ প্রভৃতিও সেইরূপ অনিষ্টকর। সহসা অতিশয় ভয় পাইলে জ্ঞানশূন্য হইতে হয় এবং কখনও বা প্রাণপর্য্যন্ত নষ্ট হয়। শিশুগণকে ভয়প্রদর্শন করা কদাচ উচিত নয়। অমূলক ভয়দ্বারা

তাহাদিগের কোমল চিত্তকে আঘাত করিলে, তজ্জনিত কুসংস্কার সকল তাহাদের মনে এত বদ্ধমূল হইয়া যায়, যে বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেও তাহারা সে সকল ভুলিতে পারে না। শোকে ব্যাকুল হওয়া কদাচ উচিত নয়। উহাতে মগ্ন হইলে নানাবিধ বায়ুরোগ উপস্থিত হইতে পারে এবং অনেকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া বিবিধ কষ্ট পায়। কোন বিষয়ে হতাশ হইলে, ভগ্নহৃদয় হইয়া অশেষ ক্লেশের ভাজন হইতে হয়; এইনিমিত্ত কোন বিষয়ে অতিরিক্ত আশা করা ভাল নয়। বিষাদের পরেই হর্ষ কিম্বা হর্ষের পরেই বিষাদ উপস্থিত হইলে, মনে এত অধিক আঘাত লাগে যে, তাহাতে উন্মাদগ্রস্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

মানসিক পরিশ্রম-ব্যতিরেকে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তাহার পরিমাণ সকলকার পক্ষে সমান নহে। কেহ অল্প পরিশ্রমদ্বারাই বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিতে পারে, কেহ বা অধিক চর্চ্চা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধিশক্তি ও বয়ঃক্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মনোবৃত্তির চালনা করা কর্ত্তব্য। শিশুদিগকে অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম করান তাহাদের ভাবি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিজনক। তাহাদিগকে দিবসের অধিকাংশসময় গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া নীরস পুস্তক পাঠ না করাইয়া, অনেক সময় গৃহের বহির্দ্দেশে ক্রীড়া ও সৃষ্টির সামান্য সামান্য সুন্দর পদার্থসকল দৃষ্টি করিতে দেওয়া উচিত। ইহা হইলে, উহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বলাধান এবং মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইবে। অনেক পিতা-

মাতা, শিশুসন্তানের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিলে, হর্ষোৎফুলচিত্তে তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যবৃদ্ধির আশয়ে তাহাকে সমধিক উৎসাহ দিয়া থাকেন; কিন্তু উহাতে, তাহার শৈশবমস্তিষ্কের অতিরিক্ত পরিচালনা হইয়া যে উহা ভাবি কালের জন্য অকর্ম্মণ্য বা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তাহা তাঁহারা ভাবেন না। এদেশে বালক ও যুবকদিগের শরীরপাত করিয়া কেবল মানসিক উন্নতিরই উদ্দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা অতিমাত্র দূষণীয়। তরুণবয়সে অতিরিক্ত অধ্যয়নে কেবল যে শরীরই শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয়, তাহা নয়, মনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এইরূপ অনৈসর্গিক প্রণালীর অনুসরণে বিদ্যার্থী উত্তরকালে শারীরিক ও মানসিক উদ্যম শীলতার অযোগ্য হইয়া পড়েন। এতদ্দেশীয় বিদ্যালয়সমূহে পদার্থবিদ্যার সমধিক অনুশীলন হইলে, শারীরিক ও মানসিক বলের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

বস্তুজ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য এদেশীয় শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান দোষ। এই বস্তুজ্ঞানই সুকুমারমতি শিশু প্রথমে কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিতে পারে; কিন্তু এদেশে শিক্ষাপ্রণালীর এমনি বিপর্য্যয় যে, শিশু বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার চিত্ত প্রায় সম্পূর্ণরূপে নৈসর্গিক বস্তুহইতে অপসারিত হইয়া, ব্যাকরণ, ভাষা, গণিতশাস্ত্র, ও অন্যান্য দুরূহ বিষয়ে নিয়োজিত হয়; সুতরাং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সে প্রাকৃতিকপদার্থ বিষয়ে পূর্ব্ববৎই অনভিজ্ঞ থাকে। প্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞানের আর এক সুফল এই যে, ইহাতে করিয়া অনেক বদ্ধমূল প্রচলিত

কুসংস্কার নির্ম্মূল হয়। উক্ত জ্ঞান আবার বিষয়ীর পক্ষেও বিশেষ উপকারী; কেননা প্রথম বয়সে কিয়ৎপরিমাণ পদার্থজ্ঞান উপার্জ্জিত হইলে, বিষয়ী তদনুশীলনে অপরকাল সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন।

জিগীষা, উচ্চাভিলাষ, হর্ষ, আশা, অনুরাগ প্রভৃতি কয়েকটি উদ্দীপক হৃদয়ভাবের যথানুরূপ পরিচালনায় মনের তেজ ও স্ফূর্ত্তি জন্মে এবং বিবিধরূপে কল্যাণকর হইয়া থাকে। কিন্তু উহাদের নিতান্ত বশীভূত হইলে অন্তরের আরাম বিনষ্ট হয়, সুতরাং শারীরিক স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে মনুষ্যের মন সাংসারিক বিভব ও বিষয়সুখে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, যে অনেকে তাহার লোভে মুগ্ধ হইয়া তল্লাভের নিমিত্ত সমস্ত মনোবৃত্তি নিয়োজিত করিয়া থাকে। ইহাতে করিয়া তাহাদের অভিলষিতসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মানসিক শান্তির যথেষ্ট হানি জন্মে। তাহাদের চিত্ত নিয়তই স্বার্থচিন্তায় ব্যাপৃত থাকাতে, অনেক সময় তাহাদের মনে সুখ থাকে না; এবং পাছে অন্যে তাহাদিগকে উচ্চপদবীহইতে স্খলিত করে, এই আশঙ্কাতেও তাহাদের মন সতত ব্যাকুল থাকে। অপিচ, স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাহাদিগকে সৎ অসৎ উভয়বিধ উপায়ই অবলম্বন করিতে হয়; কত সময় মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও অন্যের প্রতি অত্যাচার করিতে হয়; একারণ সময়ে সময়ে এই সকল দুষ্কৃতির স্মরণ হইয়া তাহাদের হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা উপস্থিত হয়; এদিকে আবার, স্বার্থসিদ্ধি না হইলে মনঃক্ষুন্ন হইয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতে হয়।

বুদ্ধিবৃত্তি, নীতিবৃত্তি ও হৃদয়ভাব এই সমস্তকে সমঞ্জস করিবার নিমিত্ত উন্নত ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবের পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠা থাকিলে, উক্ত বৃত্তিসকলের যথাবিধি অনুশীলন হয়, এবং তাহাতে করিয়া মনের অপূর্ব্ব আরাম ও শরীরের বিলক্ষণ স্বাস্থ্যবিধান হইয়া থাকে। আমাদের দেশে প্রবাদই আছে যে, যথার্থ ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বরপ্রেমী সদা আনন্দিত থাকেন এবং তাঁহার শরীর বিলক্ষণ সুস্থ ও কান্তিযুক্ত থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বসন্ত ও ওলাউঠা রোগ।

আমাদের দেশে যে কয়েকপ্রকার রোগহইতে অধিকাংশ লোক বিশেষ কষ্ট পায় এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার মধ্যে জ্বর, বসন্ত এবং ওলাউঠা রোগই সর্ব্বপ্রধান। যে সকল স্বাস্থ্যবিধান পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার বৈধ আচরণ করিলে রোগমাত্রেরই খর্ব্বতা হইবে; কিন্তু বসন্ত ও ওলাউঠা-হইতে পরিত্রাণ পাইবার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম অবগত হওয়া আবশ্যক।

বসন্ত। বসন্ত যে কি ভয়ানক রোগ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রতিবৎসর প্রায় সকল পল্লীতে এই রোগ প্রকাশ হয় এবং কোন কোন বৎসর বাহুল্যরূপে প্রকাশ হইয়া অনে-

কের প্রাণসংহার করে। যাহারা মৃত্যুহইতে পরিত্রাণ পায়, তাহাদের অনেকের চক্ষু, কর্ণ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষ হানি হয় এবং গাত্রে বসন্তের চিহ্ন যাবজ্জীবন থাকিয়া যায়।

এই রোগহইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত বাঙ্গালা অর্থাৎ মনুষ্যের বসন্তবীজের টিকার প্রথা (Inoculation) এদেশে বহুকালহইতে প্রচলিত আছে।

একব্যক্তির প্রকৃত বসন্তহইতে রস লইয়া সুস্থ ব্যক্তির চর্ম্মের নীচে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে, শেষোক্ত ব্যক্তির গাত্রে বসন্ত নির্গত হইয়া উহাকে প্রকৃত বসন্তরোগহইতে রক্ষিত করে। সচরাচর বাহুর চর্ম্মেই টিকা দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে টিকার পর গাত্রে যে বসন্ত নির্গত হয়, তাহা প্রকৃত বসন্তের ন্যায় ততোধিক দূষণীয় নহে, তথাপি এ টিকায় অনেক-প্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে। অতিরিক্ত বসন্ত বাহির হইয়া অনেকের মৃত্যু হইয়া থাকে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য অঙ্গের প্রায় হানি হয়। বাঙ্গালা টিকার আর একটি মহৎ দোষ এই যে, বসন্তরোগ সংক্রামকরূপে ব্যাপ্ত হইয়া বহু-সংখ্যক লোকের প্রাণসংশয় করে। কিন্তু এই সকল বিপদ-হইতে অব্যাহতি পাইলে সে ব্যক্তির আর বসন্তরোগ প্রায় হয় না।

প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে জেনার নামে ইংলণ্ডদেশের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক আবিষ্কার করেন যে, গাভীদিগের পালান ও বাঁটের উপর যে বসন্ত প্রকাশ হয়, তাহা হইতে রস লইয়া মনুষ্যের চর্ম্মের নিচে প্রবিষ্ট করিলে, মনুষ্যেরা বসন্তরোগ হইতে

রক্ষিত হইতে পারিবে। এই প্রথাকে ইংরাজি বা গোবীজের টিকা (Vaccination) কহে। অন্যান্য চিকিৎসকেরা প্রথমে এই মতের পোষকতা না করিয়া উহাকে অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু কিছুকাল ব্যবহারের পর সকলের প্রতীতি হইল যে, ডাক্তার জেনার এই আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা মানবজাতির একটি বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে ইহাও নিশ্চিত বা সপ্রমাণ হইল যে, গাভীর স্তনের বসন্তহইতে সদ্যো রস লইয়াই যে টিকা দিতে হইবে এমত নহে। কোন ব্যক্তিকে এই গোবীজদ্বারা টিকা দেওয়া হইলে সেই ব্যক্তির টিকা হইতে রস লইয়া অন্য ব্যক্তিকে টিকা দিলেও সেই উপকার হইবে।

ইংরাজি টিকা এক্ষণে সকল সভ্যদেশেই প্রচলিত হইয়াছে এবং উহার প্রায় সকল স্থানেই প্রত্যেক পিতামাতাকে তাহাদিগের শিশুসন্তানদিগকে একটী নির্দ্ধারিত বয়ঃক্রমের মধ্যে ইংরাজি টিকা দিতে আইনদ্বারা বাধ্য করিয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে এদেশে বাঙ্গালা টিকা দিবার প্রথা আইনদ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বোম্বাই নগরে ইংরাজি টিকা দিবার আইন প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি ১৮৮০ সাল হইতে কলিকাতা এবং উহার নিকটবর্ত্তী স্থানেও এই আইন প্রচলিত হইয়াছে।

অপর সাধারণ সকলেই যাহাতে অনায়াসে ইংরাজি টিকার আশ্রয় পাইতে পারে, এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত টিকাদার প্রায় সকল স্থানেই নিযুক্ত আছে ; কিন্তু কুসংস্কার বশতঃ অনেকে তাহা লইতে আপত্ত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে

এদেশের লোকের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, শিশুদিগকে বসন্তরোগহইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে, শীতলাদেবীর বিষম কোপে পড়িতে হইবে। এক্ষণে এ ভ্রম অনেক দূর হইয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু তথাপি ইংরাজি টিকার প্রতি অশ্রদ্ধা এখনও অনেক লোকের আছে। ইংরাজি টিকার প্রথা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত না হইলে, এই ভয়ানক বসন্ত-রোগের হ্রাস কখনই হইবে না। কখন কখন ইংরাজি টিকার দ্বারা রক্ষিত হইলেও বসন্তরোগে আক্রান্ত হইতে হয়, কিন্তু সে অবস্থায় যে বসন্ত নির্গত হয়, তাহা তত দোষস্থ বা মারাত্মক নহে। গোবীজের টিকারদ্বারা রীতিমত রক্ষিত হইলে, বসন্ত-রোগে মৃত্যু হইতে প্রায় দেখা যায় না। গোবীজের রস শরীরের মধ্যে উত্তমরূপে প্রবিষ্ট না হইলে, বসন্ত হইতে রক্ষিত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত টিকাদিবার কয়েকটী নিয়মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ১ ম, টিকাগুলি উত্তমরূপে উঠিবে, এবং যাহাতে ঘর্ষণ বা আঘাতদ্বারা উহা নষ্ট না হয়, এমত করিতে হইবে। ২ য়, তিন চারিটি টিকার ন্যূন হইলে সফল হইবে না। ৩ য়, শৈশব কালেই টিকা দিতে হইবে, নচেৎ টিকা দিবার পূর্ব্বেই বসন্তরোগ হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। গায়ে চুল্‌কনা বা অন্যপ্রকার ক্ষত, জ্বর কিম্বা পেটের পীড়া থাকিলে, সে অবস্থায় টিকা দেওয়া নিষিদ্ধ। ৪ র্থ, যৌবন-কাল উপস্থিত হইলেই বালক বালিকাদিগকে পুনর্ব্বার টিকা দেওয়া আবশ্যক। ৫ ম, মাঘ মাস অবধি চৈত্রের শেষ-পর্য্যন্ত বসন্তরোগের সময়, অতএব শীতকালের প্রারম্ভেই

ইংরাজি টিকা লওয়া আবশ্যক। এই কয়েকটি নিয়ম প্রতি পালিত হইলে, বসন্তরোগ প্রায়ই দূরীকৃত হইবে।

ওলাউঠা। অদ্যাবধি ওলাউঠারোগের প্রকৃত কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। যে সকল সাধারণ স্বাস্থ্যবিধান পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে এই রোগের অনেক পরিমাণে খর্ব্বতা হইতে পারে, কিন্তু ওলাউঠাসম্বন্ধে এই একটি বিশেষ নিয়ম স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উহা স্থানবিশেষে উৎপন্ন হইয়া সেই স্থানেই কিছু দিনের নিমিত্ত অবস্থিতি করে। এই কারণে ওলাউঠারোগ কোন কারাগারে বা সৈনাদিগের বাস-স্থানে উপস্থিত হইলে, যে নিয়মানুসারে সেই সকলস্থান পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে, সাধারণের পক্ষেও সেই নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোন গৃহে একজনের এই রোগ হইলে, সেই গৃহ অথবা সেই রোগীর ঘর, অন্ততঃ ১০ বা ১৫ দিবসেরও নিমিত্তে, পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগ সংক্রামক হইবার আশঙ্কায় যে এইরূপ করিতে হইবে, এমত নহে। কারণ, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটী সামান্য জ্বরাক্রান্ত রোগীর সেবা করিলে যেরূপ সেই জ্বরে আক্রান্ত হইবার কোন ভয় থাকে না, সেইরূপ একটী ওলাউঠারোগীর সেবা করিলেও সংশ্রবদ্বারা ওলাউঠারোগ হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু যে স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া ঐ রোগ একজনকে আক্রমণ করিয়াছে, সেই স্থানটি অচিরাৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেসকল কারণের সংযোগে ওলাউঠা উৎপন্ন হইয়া একজনকে একস্থানে আক্রমণ করিয়াছে, সেই সকল কারণ সেই স্থানে বিদ্যমান

থাকায় অন্য ব্যক্তি সেই স্থানে থাকিলে, তাহারও ঐ রোগ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

এই নিমিত্ত যেস্থানে ওলাউঠারোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সেস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হাটে, বাজারে কিম্বা যেসকল পল্লীতে ওলাউঠা প্রকাশ হইয়াছে, সে সকল স্থানে কোন মতেই যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। ওলাউঠার সময়ে অতিরিক্ত ক্লেশদায়ক শ্রম করা, গাত্রে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ লাগান, উপবাস করা এবং জনাকীর্ণস্থানে অধিকক্ষণ থাকা, কদাচ উচিত নহে। দুই বা তিনবার ভেদ হইলে উহাকে সামান্য অপচার মনে করিয়া কদাচ স্নান করিবে না। তাহাতে শরীর শীতল হইয়া ভেদ বৃদ্ধি হইতে পারে। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া মনে মনে ভীত হইবে না। ভয় এই রোগের একটি প্রধান কারণ। এই রোগ প্রায় গ্রীষ্মের সময় প্রাদুর্ভাব হয়। ফাল্গুন মাসের শেষহইতে জ্যৈষ্ঠের শেষপর্য্যন্ত ইহার সময়। কখন কখন শীতকালে এবং ঋতুপরিবর্ত্তন কালেও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্বর। আমাদের দেশে বর্ষার শেষহইতে হেমন্তের শেষপর্য্যন্ত জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। যে সংক্রামকজ্বরে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইতেছে, তাহাকে মেলেরিয়া জ্বর কহে। মেলেরিয়া একপ্রকার দূষিত বাষ্পবিশেষ, এবং নিঃশ্বাশদ্বারা বা পাণীয় জলের সহিত শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলেই উহা জ্বররূপে প্রকাশ হয়। আর্দ্র মৃত্তিকা প্রখর সূর্য্যকিরণে শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইলেই, উহার উপরিভাগ হইতে মেলেরিয়া বাষ্প উৎপন্ন হইতে থাকে। বর্ষায় মৃত্তিকা জলসিক্ত হইয়া শরতের

প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক হইতে থাকে, এই নিমিত্ত শ্রাবণ মাসের শেষ-হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষপর্য্যন্ত মেলেরিয়া জ্বরের অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। নদীর তীর, জলপ্লাবিত ভূমি, সোঁতা ও জলসিক্ত স্থানসকল মেলেরিয়ার প্রধান স্থল। বাটীর মধ্যে এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানহইতে যাহাতে জল সহজে নিকাশ হইতে পারে এবং যে গ্রামে বাস করা যায় তাহার জল নিকাশের নিমিত্ত সাধারণ জলপ্রণালী রাখিয়া যাহাতে গ্রামের শুষ্কতা পরিরক্ষিত হয়, এরূপ চেষ্টা বিশেষ রূপে করা কর্ত্তব্য। পল্লিগ্রামের অনেকস্থানে স্বাভাবিক জলনিকাশের পথসকলের রোধ বা অন্যপ্রকার ব্যতিক্রম হওয়াতে, সেই সকল স্থান মেলেরিয়ার আবাস হইয়া পড়িয়াছে।

উষ্ণপ্রধান দেশেই মেলেরিয়ার অধিক প্রভাব। মেলেরিয়া-বাষ্প বায়ু অপেক্ষা অধিক ভারি বলিয়া, উহা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না এবং বায়ুর জলীয় বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া নিম্নস্থানে অর্থাৎ মৃত্তিকার সন্নিকটেই অবস্থান করে। এই নিমিত্ত যে স্থানে মেলেরিয়া অধিক প্রবল সে স্থানে একতলা অপেক্ষা দুইতলা ঘরে শয়ন করা বিহিত। দিবসে এই বাষ্প বায়ুর সহিত মিলিত থাকে। দিবাবসানের সহিত বায়ুর উষ্ণতা লাঘব হইতে আরম্ভ হইলেই উহা নিম্নভাগে পতিত হইতে থাকে; এই নিমিত্ত দিবস অপেক্ষা রাত্রিকালেই মেলেরিয়া হইতে অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে এবং মৃত্তিকার উপরে নিদ্রা যাওয়া অতিশয় নিষিদ্ধ। মেলেরিয়া বাষ্প বায়ুদ্বারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হইয়া থাকে; কিন্তু উচ্চ বৃক্ষ সমূহ,

নদী প্রভৃতি জলরাশি, পর্ব্বতাদি এবং বহুসংখ্যক ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটিদ্বারা উহার গতি কিয়ৎ পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া থাকে। অগ্নিদ্বারাও মেলেরিয়া বিনষ্ট হয়।

জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা নির্ণয়।

কেহ তর্ক করিতে পারেন যে, স্বাস্থ্যবিধানের যে সকল নিয়ম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সকলই যুক্তিসিদ্ধ বটে; কিন্তু উহার অনুসরণ করিলে রোগের যে বাস্তবিক খর্ব্বতা হইবে এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা আমাদিগের পীড়ার যে হ্রাস হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? উভয় অবস্থার মৃত্যুসংখ্যা নির্ণয় করিয়া দেখিলেই, ইহার মীমাংসা হইতে পারে। ইংলণ্ডদেশে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল প্রকৃতরূপে রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে, প্রতিবৎসর একসহস্র সৈন্যের মধ্যে প্রায় ১৮ জনের মৃত্যু হইত; কিন্তু এক্ষণে স্বাস্থ্যবিধানের সুফল প্রভাবে ৮ জনের অধিক নষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজ সৈন্যদিগের মধ্যে বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যা এক সহস্রে প্রায় ৬৯ ছিল; কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল প্রচলিত হওয়া অবধি মৃত্যুসংখ্যার অনেক খর্ব্বতা হইয়াছে। ১৮৭১ হইতে ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে গড়ে প্রতিসহস্রে প্রায় ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কয়েদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখিলেও জানিতে পারাযায় যে, পূর্ব্বে যখন কারাগারে স্বাস্থ্যবিধানের নিয়ম সকল রীতিমত প্রচলিত হয় নাই, তখন কয়েদীদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা অধিক ছিল। ১৮৫৯

হইতে ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত নয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাপ্রদেশের কারাগার সমূহে বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যা একসহস্রে প্রায় ৭৩ ছিল; কিন্তু তাহার পর স্বাস্থ্যবিধানের প্রভাবে ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত নয় বৎসরের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা ৩৮ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। কোন কোন বিশেষ পীড়ার দৃষ্টান্ত দেখিলেও জানিতে পারা যায় যে, যে সংক্রামক জ্বর ভারতবর্ষে এত সাধারণ, উহা পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশেরও কোন কোন স্থানে সাধারণরূপে প্রকাশ হইত, কিন্তু সেই সকল স্থানের জলনিকাশের উত্তম প্রণালী করিয়া দেওয়াতে, এবং কৃষিকার্য্যের দ্বারা ঐ সকল স্থান ক্রমে উর্ব্বরা হওয়াতে, এই জ্বর তথা হইতে এককালে দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে গোবীজের টিকার প্রথা সাধারণরূপে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, বসন্তরোগের উপদ্রব, এক্ষণে ভারত-বর্ষের অনেক স্থানে যেরূপ আছে, সে সকল স্থানেও তদ্রূপ ভয়ানক ছিল। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম সকল প্রকৃতরূপে প্রতি-পালিত হইলে, ওলাউঠারোগেরও হ্রাস হইতে পারে।

বাঙ্গালাপ্রদেশের কারাগারসমূহে মৃত্যুসংখ্যাসম্বন্ধে যে প্রথম নয় বৎসরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ওলা-উঠারোগে প্রতিবৎসর একসহস্রে ১০ জনের মৃত্যু হয়, কিন্তু শেষ নয় বৎসরের মধ্যে ৩ জনের অধিক নষ্ট হয় নাই। ওলাউঠা অতিশয় সাংঘাতিক রোগ। দুইজনের ঐ পীড়া হইলে প্রায় একজনের মৃত্যু হইয়া থাকে, অর্থাৎ যত সংখ্য লোকে এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের মৃত্যু হয়।

অন্যান্য রোগ, যাহা ওলাউঠার ন্যায় তত সাংঘাতিক নয়, তাহা হইতে একজনের মৃত্যু হইলে, একের অধিক লোক সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধারণ সমাজের মধ্যে রোগের সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন; কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা অনায়াসেই স্থির করা যাইতে পারে। মৃত্যুসংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিলে কোন্ স্থানে কোন্ রোগ অধিক প্রবল হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই জ্ঞাত হওয়া যাইতে পাবে; এবং রোগ জানিতে পারিলেই, উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উহাকে দূর করিবার চেষ্টাও করা যাইতে পারে। মৃত্যুসংখ্যার তালিকা রাখায় আরও জানিতে পারা যায় যে, কোন্ রোগে কোন্ স্থানে প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস বা প্রতি বৎসর কত লোকের মৃত্যু হয়, এবং তাহা জানিতে পারিলে লোকে সতর্ক হইয়া রোগের প্রতিবিধান করিতে সচেষ্টিত হইতে পারে।

জন্মসংখ্যা। জন্মসংখ্যাও নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সমাজের অধোগতি বা উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। জন্মের সংখ্যার খর্ব্বতা সমাজের দুরাবস্থার একটি প্রধান চিহ্ন। এক্ষণে কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে জন্ম ও মৃত্যুসংখ্যার তালিকা রাখিবার নিয়ম আইনদ্বারা প্রচলিত হইয়াছে। যাহাতে সেই নিয়ম রীতিমত প্রতিপালিত হয়, সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১৭	রজ্জুর	বেণীর
১১	২৩	লিপ্ত	সঙ্কুচিত
১২	৪	রক্ষিত	আবৃত
১৮	২৩	সংকোচিত	ঐ মাংসপেশীর সংকোচিত
২১	১৭	আবদ্ধ	আবৃত
২৪	১৭	আলবিউমেন	শ্লেষ্মা
২৪	১৮	ফাইব্রিন্	মাংসসূত্র
২৪	১৯	তৈলবৎপদার্থ	মেদ
২৪	২০	খনিজ	লাবণ
৩৯	১৬	ক্ষীর বা পনির	ছানা
৩৯	১৭	জল,	জল;
৪০	১১	পনির বা ক্ষীর	ছানা
৪১	৮ ও ১০	পনির	ছানা
৪২	৪	ফাইব্রিন্	মাংসসূত্র
৪৪	৬	সর্ব্বোৎকৃষ্ণ	সর্ব্বোৎকৃষ্ট
৪৪	১৮	আলবিউমেন্	শ্লেষ্মা
৪৭	১	সম্পূর্ণ	কেবল

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৩	২	৫ বা ৬	৭
৫৫	৮	ফল	ফল মূল ইত্যাদি
৫৬	১৬	শর্করা	শর্করা অর্থাৎ চিনি
৬৬	১৫	ভেদক	সারক
৬৭	১৭	ভেদক	সারক
৭০	১	মূলপত্রাদি হইতে	মূল হইতে
৭০	৫	কিম্বা	এবং
৭০	১৮	ধান্যের রস	শষ্য
৭০	২১	অজ্ঞাতকম্পন	আতঙ্গকম্পন
৭৫	২১	জ্বলনীয়	দাহক
৭৫	২২	জ্বলিয়া উঠে	অগ্নি জ্বলিতে থাবে
৮১	৪	ঠিক	প্রায়
৮১	২০	Sulphorated	Sulphurated
৮৩	১৮	উদ্ভিজ্জোরা	উদ্ভিদ
৯১	৪	এদেশে	এ প্রদেশে
৯৫	১০	বিলে	বিলের নিকট নদী
১০১	১১	জিহ্বামর্দ্দন	জিহ্বামার্জ্জন
১২০	১৩	আশ্বারোহন	অশ্বারোহণ